# ভারতবর্ষে মুঘল শাসন (১৫২৬-১৭০৭ খ্রি.)

**ইউনিট ৩**

**ভূমিকা**

**ভারতবর্ষে মুঘল শাসন (১৫২৬-১৭০৭ খ্রিঃ)**

ভারতবর্ষে মুঘল রাজবংশের সূচনা ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ও মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। ১৫২৬ খ্রি. জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই বংশ কয়েক শতাব্দি ধরে শাসন পরিচালনা করে। জানা যায় যে, মুঘল শব্দটি এসেছে 'মোঙ্গ' বা 'মোঙ্গল' শব্দ হতে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ছিলেন পিতার দিক থেকে চেঙ্গিস খান এবং মাতার দিক হতে তৈমুর লঙ এর বংশধর। মুঘল বংশ প্রাথমিকভাবে তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রন ও শক্তি নিয়ে ১৫২৬-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে শাসন পরিচালনা করে। পরবর্তীতে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বাধীনতা হারালে পরবর্তী ১০০ বছর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল শাসকগণ নামমাত্র শাসক হিসেবে পরিণত হয়। তবে গৌরব ও আধিপত্যের যুগে মুঘলরা ছিল পারস্যের সাফাভী ও তুরস্কের ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দী। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন আকবর, সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব প্রমুখ। আকবর ছিলেন রাজ্যবিজেতা, সমরকূশলী এবং প্রজ্ঞাবান ও কূটনৈতিক শাসক। শিল্পকলা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও স্থাপত্য বিদ্যায় নৈপুন্য দেখিয়েছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান। গোঁড়া সুন্নী মতবাদ ও ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য আওরঙ্গজেব ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে অবসানের আগ পর্যন্ত মুঘল বংশই ছিল ভারতের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু এবং শক্তি ও সংহতির উৎস, এই বংশের অবসানের সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায়।

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | **ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ সপ্তাহ** |

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ-**

পাঠ- ১ : ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা: সম্রাট বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ- ২ : সম্রাট হুমায়ুন: মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব
পাঠ- ৩ : শূর বংশ: শেরশাহের শাসন সংস্কার
পাঠ- ৪ : শেরশাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ- ৫ : সম্রাট আকবর: রাজ্য বিজয়, ধর্মনীতি ও রাজপুত নীতি
পাঠ- ৬ : সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থা, সংস্কারসমূহ ও কৃতিত্ব
পাঠ- ৭ : সম্রাট জাহাঙ্গীর: নূরজাহানের প্রভাব, চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ- ৮ : সম্রাট শাহজাহান: স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ, পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব, চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ- ৯ : সম্রাট আওরঙ্গজেব: দক্ষিণাত্য নীতি, ধর্মনীতি, শাসন পদ্ধতি, চরিত্র ও কৃতিত্ব
পাঠ- ১০ : মুঘল সাম্রাজ্যের পতন: কারণ ও ফলাফল
পাঠ- ১১ : মুঘলদের প্রশাসন, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা
পাঠ- ১২ : মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন

# পাঠ-৩.১ ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা: সম্রাট বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- বাবরের প্রাথমিক জীবন ও অভিযানসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ও খানুয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন ও
- বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | **ফারগানা, সমরকন্দ, কাবুল, পাদশাহ (বাদশাহ), পানিপথ, রাজপুত, গাজী ও আফগান** |

## বাবরের প্রাথমিক জীবন

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ছিলেন ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্থানের এক ক্ষুদ্র রাজ্য ফারগানায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবরের পিতা উমর শেখ মির্জা ছিলেন দুর্ধর্ষ সমর নেতা তৈমুরের বংশধর এবং ফারগানা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি। তাঁর মাতা কুতলুঘ নিগার খানম ছিলেন মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের অধস্তন বংশধর ইউনুস খানের কন্যা। বাবরের পিতা উমর শেখ মির্জা ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে মাত্র ১১ বছর বয়সে বাবর পিতৃ সিংহাসনে উপবেশন করেন। সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পর বাবর তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজন বিশেষত উজবেক নেতা সাইবানী খানের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। উল্লেখ্য মধ্যএশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ও সৌন্দর্যময় নগরী ছিল সমরকন্দ। বাবরের পিতৃব্য আহমদ মির্জার মৃত্যুর-পর ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার, ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার এবং ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বারের মতো তিনি (বাবর) সমরকন্দ অধিকার করেন। ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে এক যুদ্ধে সাইবানী খান বাবরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সমরকন্দ থেকে বিতাড়িত করেন। একই সময়ে বাবর পিতৃরাজ্য ফারগানা থেকেও বিতাড়িত হন। ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে বাবর কাবুলের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে কাবুলের শাসক আর্ঘুনকে পরাজিত করে কাবুল অধিকার করেন। বাবর অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র আফগানিস্তানে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে 'পাদশাহ' (বাদশাহ) উপাধি গ্রহণ করে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাবুলের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে উজবেকদের সাথে সংঘটিত এক যুদ্ধে বাবর পরাজিত হয়ে সমরকন্দ থেকে বিতাড়িত হন। অতঃপর মধ্য এশিয়ায় রাজ্য স্থাপন অসম্ভব মনে করে বাবর ভারতবর্ষের দিকে মনোনিবেশ করেন।

## বাবরের ভারত অভিযান

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ঐতিহাসিক পানিপথের প্রথম যুদ্ধের পূর্বে ভারতে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন যা সাধারণত পর্যবেক্ষণমূলক অভিযান নামে সমধিক পরিচিত। বাবর ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে বাদাখসান এবং ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে কান্দাহার হস্তগত করেন। স্বীয় পুত্র হুমায়ুন ও কামরানকে যথাক্রমে বাদাখসান ও কান্দাহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদীর অত্যাচার ও নির্মম আচরণে অসন্তুষ্ট আফগান আমির ওমরাহদের বিশেষ অনুরোধে পাঞ্জাবের তৎকালীন শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী, ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খান জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরকে ভারতবর্ষ আক্রমণে আহ্বান জানালে উচ্চাভিলাষী বাবর তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে লাহোর দখল করেন। এ সময় বাবর শিয়ালকোট, দিপালপুর এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থানও অধিকার করেন। এমতাবস্থায় দৌলত খান লোদী ও আলম খান বাবরের মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পেরে তাঁর বিরোধিতা শুরু করলে বাধা হয়ে বাবর পূর্ণোদ্যমে ভারত অভিযান আরম্ভ না করে সসৈন্যে কাবুল প্রত্যাবর্তন করেন।

**পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (২১ এপ্রিল, ১৫২৬ খ্রি.)**

পানিপথ বর্তমান ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার উত্তরে হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত। ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে বাবর কাবুল থেকে আগমন করে পাঞ্জাবের শাসক দৌলত খান লোদীকে পরাজিত করে লাহোর তথা সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদী ও জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরের মধ্যে ঐতিহাসিক পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। 'তুযুক-ই-বাবুরী' বা 'বাবরনামা'র বিবরণ অনুযায়ী পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সেনাবাহিনীতে ছিল ১২,০০০ পদাতিক, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ। এই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যবাহিনীতে ছিল ১,০০,০০০ সৈন্য ও ১০০ হস্তী। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর সর্বপ্রথম এই যুদ্ধে কামানের ব্যবহার করেন। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত করেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ করার মাধ্যমে লোদী বংশের পতন ঘটে। ফলে উপমহাদেশে সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে এবং মুঘল বংশের রাজত্ব শুরু হয়।

**যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের কারণ**

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের পশ্চাতে অন্যতম কারণ ছিল। যথা-

১. বাবরের তুলনায় ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়া সত্ত্বেও বাবরের সৈন্য বাহিনী ছিল সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল।
২. বাবর এই যুদ্ধে কামানসহ অন্যান্য উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেন, যা ইব্রাহিম লোদীর কাছে অজানা ছিল।
৩. বাবর ছিলেন একজন দৃঢ় চরিত্রবান ও কুশলী সৈন্যাধ্যক্ষ। অন্যদিকে ইব্রাহিম লোদী ছিলেন সৈন্য পরিচালনা ও যুদ্ধবিদ্যায় একজন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি।
৪. সেনাপতি ওস্তাদ আলী ও মোস্তফার নেতৃত্বে গোলন্দাজ বাহিনীর কর্তব্যনিষ্ঠা ও সুনিপুণ যুদ্ধ কৌশল বাবরের সফলতার অন্যতম কারণ।
৫. নানা জাতির অভিজ্ঞ সৈন্যদের নিয়ে গঠিত আফগান বাহিনীর মধ্যে কোন একতা ছিল না। অন্যদিকে বিভিন্ন জাতির সৈন্যদের সমন্বয়ে বাবরের সেনাবাহিনী গঠিত হলেও তারা ছিল বাবরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ।
৬. ইব্রাহিম লোদীর নিষ্ঠুর আচরণের ফলে আমির ওমরাহ ও আত্মীয় স্বজন ছিল তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট, যা বাবরের অনুকূলে ছিল।

**পানিপথের যুদ্ধের ফলাফল**

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। এই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের ফলে তিন শতাব্দির অধিককাল স্থায়ী দিল্লি সালতানাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধে বাবরের বিজয়ের ফলেই ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয় লাভের ফলে ভারতবর্ষের বিপুল ধন-সম্পদ বাবরের হস্তগত হয়। ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম গোলন্দাজ বাহিনী নামে একটি বিশেষ বাহিনী গড়ে তুলেন।

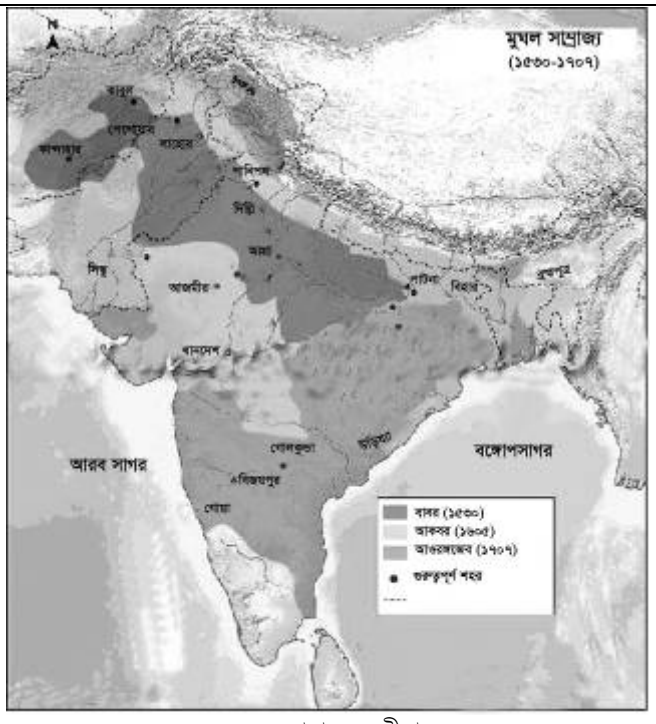

মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা

**খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ)**

মেবারের রাজপুত নেতা রানা সংগ্রাম সিং বাবরকে ভারত আক্রমণে পর্যাপ্ত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও তিনি তা রক্ষা করেন নি। রানা সংগ্রাম সিংহের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাবর তাঁর পূর্বপুরুষ তৈমুর লঙের ন্যায় ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। তখন রানা সংগ্রাম সিংহ ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লি

সালতানাতের ধ্বংসস্তুপের উপর হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ঐতিহাসিক পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল বংশের গোড়াপত্তন করলে রাজপুত শক্তি মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে বাবরের বিরোধিতা করে। রানা সংগ্রাম সিংহ বিলসার সিলহদা, ধুনগড়ের উদয়সিংহ, মারবাড়ের ভীমসিংহ, চান্দেরীর মেহেদী রাও প্রমুখ অসংখ্য রাজপুত সর্দার এবং হাসান খান মেওয়াটির সাহায্যে একটি শক্তিশালী সামরিক জোট গঠন করেন। সম্মিলিত সামরিক জোটে রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে ১২০ জন রাজপুত সর্দার, ৮০ হাজার অশ্বারোহী (মতান্তরে ১,২০,০০০ অশ্বারোহী) ৫ শত হস্তী বাহিনী (মতান্তরে ১,০০০ হস্তীবাহিনী) এবং বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করে। বিপুল সংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে বাবর মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে স্বয়ং সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে রাজপুতদের সমন্বয়ে গঠিত এই বিশাল বাহিনীর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ক্ষুদ্র বাহিনীকে বাবর ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) ন্যায় এক অনলবর্ষী ও তেজোদীপ্ত ভাষণ দ্বারা অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই মার্চ আগ্রার অনতিদূরে ফতেহপুর সিক্রির নিকট খানুয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও যুদ্ধ কৌশলের অপকর্ষতার ফলে রানা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

**খানুয়ার যুদ্ধের ফলাফল**

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে যে সকল যুদ্ধ ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী যুদ্ধ নামে পরিচিত সেগুলোর মধ্যে খানুয়ার যুদ্ধ অন্যতম। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ঐতিহাসিক পানিপথের যুদ্ধের পর ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের খানুয়ার যুদ্ধ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লির লোদী বংশের সর্বশেষ নামমাত্র সুলতান ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধের ফলে ভারতে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাজপুত শক্তির শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রানা সংগ্রাম সিংহের হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং রাজপুত শক্তির প্রাধান্য ক্ষুণ্ন হয়। খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাবরের প্রাধান্য ও ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছিল। বাবর এই যুদ্ধে জয়লাভের পর তাঁর ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দু কাবুল থেকে হিন্দুস্থানে স্থানান্তর করেন। খানুয়ার যুদ্ধে রাজপুত শক্তির পুনরুজ্জীবনের আশা স্থায়ীভাবে বিলুপ্ত করে বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর 'গাজী' উপাধি ধারণ করেন।

**গোগরার যুদ্ধ (৬মে, ১৫২৯ খ্রি.)**

খানুয়ার যুদ্ধে সম্মিলিত রাজপুত শক্তিকে পর্যুদস্ত করার পর জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর দুধর্ষ আফগান দলপতিদের দমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা জৌনপুরের তৎকালীন শাসক মাহমুদ লোদী, বিহারের শের খান বাবরের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী জোট গঠন করেন। বাবর নিজ পুত্র আসকারীকে পাঠিয়ে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেন। মাহমুদ লোদীর বিরুদ্ধে আসকারীর নেতৃত্বে প্রেরিত এই বাহিনী পথিমধ্যে এলাহাবাদ, চুনার, বেনারস হস্তগত করে পাটনার সন্নিকটে গোগরা নদীর তীরে বাংলা ও বিহারের আফগানদের সম্মিলিত সেনাবাহিনী বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। জৌনপুরের শাসক মাহমুদ লোদী ও বাংলার শাসক নুসরত শাহের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত আফগান সেনাবাহিনী ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে ঐতিহাসিক গোগরার যুদ্ধে বাবরের নেতৃত্বাধীন মুঘল সেনাবাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে গোগরার যুদ্ধের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের পানিপথের প্রথম যুদ্ধ এবং ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের খানুয়ার যুদ্ধের পর ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের গোগরার যুদ্ধ পরিপূরক যুদ্ধ হিসেবে সমধিক পরিচিত। এই যুদ্ধই ছিল বাবরের বর্ণাঢ্য জীবনের সর্বশেষ বৃহৎ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে আফগানদের পুন: সংঘটিত হওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা চিরতরে বিনষ্ট হয়।

**বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব**

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ছিলেন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক। বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী বাবর এশিয়ার ইতিহাসে এক আকর্ষণীয়, রোমাঞ্চকর ও কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র। বাবর ছিলেন সমসাময়িক এশিয়ার শাসকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীপ্তিমান চরিত্রের অধিকারী। বাবরের চরিত্রে সামরিক প্রতিভা, বীরসুলভ দু:সাহসিকতা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, অদম্য অধ্যবসায়, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, অনন্যসাধারণ দুঃসাহসিকতা, অটুট মনোবল, অতুলনীয় রণনিপুণতা, দূরদর্শী রাজনৈতিক মেধা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, পিতৃবাৎসল্য এবং গভীর মমত্ববোধ প্রভৃতি গুণাবলির এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। বাবরের ধমনীতে বিশ্ব ত্রাস সৃষ্টিকারী তৈমুর লঙ ও দুধর্ষ চেঙ্গিস খানের শোণিত ধারা প্রবাহিত ছিল। বাবরের মধ্যে

তুর্কীদের সাহস ও কর্মদক্ষতার সাথে সাথে মোঙ্গলদের তেজস্বিতা ও সমর নিপুণতার এবং দুর্ধর্ষ যাযাবর তাতারদের বীরত্ব ও অস্থিরতার সঙ্গে পারসিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বাবর ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একজন খাঁটি সুন্নী মুসলমান। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীকে, ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে মেবারের রাজপুত নেতা রানা সংগ্রাম সিংহকে, ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে চান্দেরী অভিযানের সময় মেদেনী রাওকে এবং সর্বশেষ ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে গোগরার যুদ্ধে সম্মিলিত আফগান শক্তিকে পরাস্ত করার মধ্যে বাবরের উন্নত সামরিক কৌশল, রণনিপুণতা এবং একজন সফল সমর নায়কের কৃতিত্ব ফুটে উঠে। ভারতবর্ষে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠা করে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর এক নতুন সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।

**শাসক হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব**

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁর সময় মুঘল সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাবুল থেকে পূর্বে বিহার এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে চান্দেরি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মাত্র চার বছরের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে বাবর বিশাল সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় স্বল্পতার কারণে বিজিত অঞ্চলব্যাপী চলমান শাসনব্যবস্থাকেই অব্যাহত রাখেন। তবে বাবর খলিফার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে স্বয়ং 'বাদশাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ববর্তী আমলে প্রচলিত সামন্ত প্রথা ও জায়গীরদারী প্রথা চালু রাখলেও তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব সীমিত করেন। বাবরের শাসনামলে বিভাগীয় প্রধান এবং বাদশাহের সাথে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন প্রধানমন্ত্রী নিজামউদ্দিন খলিফা। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হত ওয়ালী (প্রাদেশিক গভর্ণর) দিওয়ান (রাজস্ব কর্মকর্তা), সিকদার (সমর কর্মকর্তা) ও কোতয়াল (নগর কর্মকর্তা) প্রমুখ কর্মকর্তাদের দ্বারা। বাবর সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী ১৫ মাইল অন্তর অন্তর ডাকচৌকির ব্যবস্থা করেন।

**শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব**

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী এবং একজন রুচিশীল শাসক। তিনি দিল্লি ও আগ্রায় ২০টি উদ্যান, বহু পাকা নর্দমা, সেতু ও অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। বীরযোদ্ধাও সমরকুশলী বাবরের সাহিত্যানুরাগ ছিল প্রগাঢ়। তিনি তুর্কী ও ফার্সি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি তুর্কি ও ফার্সি ভাষায় অসংখ্য কবিতা রচনা করেন। তাঁর রচিত তুর্কি কবিতার সংকলন 'দিওয়ান' নামে পরিচিত। ফার্সি ভাষায় বাবর এক প্রকার নতুন ছন্দ আবিষ্কার করেন যা সাধারণত 'মুবইয়ান' নামে সুপরিচিত। জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরের সাহিত্যানুরাগের শ্রেষ্ঠ নির্দশন তুর্কি ভাষায় রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'তুযুক-ই-বাবরী'। 'তুযুক-ই-বাবরী' মুঘল ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | **শাসক হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব মুল্যায়ন করুন।** |

**সারসংক্ষেপ :**

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১১ বছর বয়সে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণকারী বাবর কালের পরিক্রমায় পিতৃরাজ্য ফারগানা ও সমরকন্দ থেকে বিতাড়িত হয়ে ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে কাবুল দখল করেন। বাবর ভারতবর্ষে কয়েকটি পর্যবেক্ষণমূলক অভিযানে সফলতা লাভের পর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে হত্যা করে দিল্লি সালতানাতের স্থলে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১**

**বহু নির্বাচনী প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১। বাবরের পিতার নাম ছিল-

ক. শায়বানী খান খ. উমর শরীফ গ. উমর শেখ মির্জা ঘ. আহমদ মির্জা

২। বাবর পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন-
ক. মাত্র ৮ বছর বয়সে খ. মাত্র ৯ বছর বয়সে গ. মাত্র ১০ বছর বয়সে ঘ. মাত্র ১১ বছর বয়সে

৩। বাবর কান্দাহার হস্তগত করেন-
ক. ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে গ. ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে

৪। পানিপথ বর্তমান ভারতের-
ক. তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থিত খ. গুজরাটে অবস্থিত গ. তেলেঙ্গানা রাজ্যে অবস্থিত ঘ. হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্নঃ**

সিরাজ আলী শাহ সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি আকর্ষনীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পরবর্তীতে এক যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষে একটি স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার মর্যাদা লাভ করেন। এই রাজবংশটি সুদৃঢ় করতে তাকে রাজপুতদের সাথে এক সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল, যেটি ভারতবের্ষর পরবর্তী ইতিহাসের পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের অনুরূপ ছিল।

১. মুঘল বংশ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
২. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সম্পর্কে লিখুন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের রাজপুতদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করুন। ৩
৪. মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসকের চরিত্র ও কৃতিত্ব পাঠ্য বইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করুন। ৪

# পাঠ-৩.২ সম্রাট হুমায়ুন: মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব ও সম্রাট হুমায়ুন (১৫৩০-৪০; ১৫৫৫-৫৬ খ্রি.)

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- হুমায়ুনের প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসনারোহণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- শেরশাহের সাফল্য ও হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- সম্রাট হুমায়ুনের চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | **আফগান, মুঘল, বারলাস, দাদরাহ, চুনার, দুর্গ, সুরুজগড়, জান্নাতাবাদ ও বিলগ্রাম** |

### প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসনারোহণ

মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরের জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে শিয়া মাতা মাহিম বেগমের গর্ভে কাবুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর অপর তিন ভ্রাতা ছিলেন কামরান, আসকারী এবং হিন্দাল। বাল্যকালেই হুমায়ুন আরবি, ফার্সী ও তুর্কী ভাষাসহ কাব্য ও সাহিত্যের পাশাপাশি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বাবরের শাসনামলে হুমায়ুন বাদাখশান, হিসার ফিরোজা এবং সম্বলের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পিতা বাবরের মৃত্যুর পর ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে ডিসেম্বর মাত্র ২৩ বছর বয়সে পিতৃ মনোনয়ন অনুসারে হুমায়ুন 'নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন' নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পর সম্রাট হুমায়ুন পিতৃ নির্দেশ অনুসারে তাঁর ভ্রাতা কামরানকে কাবুল ও কান্দাহারের, হিন্দালকে আলওয়ার ও মেওয়াটে এবং আসকারীকে সম্বলের শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এছাড়াও পিতৃব্য পুত্র মির্জা সুলায়মানকে তিনি বাদাখশানের শাসনভার অর্পণ করেন। সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালকে দু'টি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্বে ১৫৩০-১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্বে ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল বংশের দ্বিতীয় শাসক হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। মধ্যখানে ১৫৪০-১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি শের খান (শের শাহ) কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে পারস্যের শাসক শাহ তাহমাসপের রাজদরবারে আশ্রিত ছিলেন।

### মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের সূত্রপাত

আফগান শক্তির বিরোধিতাই ছিল সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহমুদ লোদীকে দিল্লির সিংহাসনে উপবেশন করার ষড়যন্ত্রে আফগান অভিজাত শ্রেণির সাথে বুন্দেলখণ্ডের শাসনকর্তাও লিপ্ত ছিলেন। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন বুন্দেলখণ্ডের রাজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু অদূরদর্শী সম্রাট হুমায়ুন প্রচুর অর্থের বিনিময়ে এই অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদীর ভ্রাতা মাহমুদ লোদীর নেতৃত্বে আফগানরা জৌনপুরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে জৌনপুরের মুঘল শাসক জুনাইদ বারলাসকে বিতাড়িত করেন। আফগান বাহিনীর বিশৃঙ্খলার সুযোগে হুমায়ুন ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌর সন্নিকটে দাদরাহ বা দৌরাহর যুদ্ধে সম্মিলিত আফগান শক্তিকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। নিরূপায় হয়ে মাহমুদ লোদী পাটনা এবং কয়েকদিন পর বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাহমুদ লোদী বাংলায় মৃত্যুবরণ করলে লোদী আফগান বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। আফগান বাহিনীর একটি বিরাট অংশ আফগান নেতা শের খানের নেতৃত্বে বারানসীর দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গার তীরে অবস্থিত চুনার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্রাট হুমায়ুন চুনার দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হুমায়ুন দীর্ঘ ৪ মাস ধরে চুনার দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু ইতোমধ্যে গুজরাটের শাসক বাহাদুর শাহ আগ্রা অভিযান করেন। এ সংবাদে বিচলিত হয়ে সম্রাট হুমায়ুন শেরখানের মৌখিক আনুগত্যে বিশ্বাস স্থাপন করে বিহার ও চুনার দুর্গ রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। চুনার দুর্গটি শেরখানের হস্তে সমর্পণ করে সম্রাট হুমায়ুন রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। কেননা এই দুর্গকে কেন্দ্র করে শেরশাহ নিজের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন এবং হুমায়ুনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্রুতে পরিণত হন।

**হুমায়ুন ও বাহাদুর শাহের সংঘর্ষ**

গুজরাটের বাহাদুর শাহ ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী ও প্রভাবশালী শাসক। তিনি ছিলেন পাঠান শক্তির উৎস। প্রবল প্রতাপশালী সুলতান বাহাদুর শাহের রাজত্বকালকে গুজরাটের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর শাসনামলেই গুজরাটের সমধিক বিস্তৃতি সাধিত হয়েছিল। বাহাদুর শাহ ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে মালব, ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে রায়সীন দখল এবং ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে চিতোরের শিশোদীয় নেতৃবৃন্দকে পরাস্ত করেন এবং বেরার, খান্দেশ ও আহমদনগরের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাহাদুর শাহ দিল্লি অধিকারের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ জামান মীর্জাকে আশ্রয় ও সহযোগিতা প্রদান করে সম্রাট হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচনা দান করেন। এছাড়া ও তিনি আফগান নেতা আলম খান লোদীর পুত্র তাতার খানকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত বিয়ানা অঞ্চল অধিকার করার ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। এছাড়া সুলতান বাহাদুর শাহ অসংখ্য বিদ্রোহী আফগান নেতৃবৃন্দকে তার রাজ্যে আশ্রয় প্রদান করে সম্রাটের ক্রোধের উদ্রেক করেন। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে সম্রাট হুমায়ুন মালব গমন করার সময় গুজরাটীদের দ্বারা অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হয়ে মেবারের রাণী কর্ণাবতী সম্রাট হুমায়ুনের সাথে রাখী বন্ধনের (ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের) প্রস্তাবসহ সাহায্য কামনা করলে সম্রাট বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রযাত্রা করেন।

**মান্দাসোর যুদ্ধ (১৫৩৫ খ্রি.)**

উপরোল্লিখিত কারণ সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মান্দাসোর নিকট একটি কৃত্রিম হ্রদের তীরবর্তী স্থানে সুলতান বাহাদুর শাহ ও সম্রাট হুমায়ুনের সেনাবাহিনীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বাহাদুর শাহ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন এবং মুঘল সেনাবাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে একপর্যায়ে পর্তুগীজদের অধিকৃত দিউ নামক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। হুমায়ুন অতঃপর মালব, চাম্পানের দুর্গ এবং দ্রুতগতিতে গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদ হস্তগত করেন। এসময় মুঘল বাহিনী গুজরাট এবং চাম্পানের দুর্গ থেকে প্রচুর ধনরত্ন লাভ করে। সম্রাট হুমায়ুন গুজরাটের শাসন ভার তার ভাই আসকারীর উপর ন্যস্ত করে আগ্রায় চলে আসেন। কিন্তু আসকারী ছিলেন অযোগ্য ও অকর্মণ্য। তার অপশাসনে গুজরাটে অরাজকতা দেখা দেয় এবং এই অরাজকতা ও গোলযোগের সুযোগে বাহাদুর শাহ পর্তুগীজদের সহায়তায় মুঘলদের হাত থেকে পুন:রায় গুজরাট উদ্ধার করেন।

**হুমায়ুনের সাথে শেরখানের সংঘাত**

শেরখানের বাল্য নাম ছিল ফরিদ। তিনি ছিলেন আফগান জাতির শুর উপদলভুক্ত। তাঁর পিতা হাসান ছিলেন বিহারের সাসারামের জায়গীরদার। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে চান্দেরী দুর্গবিজয়ের সময় সম্রাট জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরকে শেরখান (শেরশাহ) সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা প্রদান করেন। প্রীত হয়ে সম্রাট বাবর পুরস্কারস্বরূপ শেরখানকে পিতৃ জায়গীর সাসারামে পুন: প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে শেরখান বারানসীর নিকটবর্তী চুনার দুর্গের অধিপতি তাজ খানের বিধবা পত্নী লাদ মালিকাকে বিবাহ করার মাধ্যমে চুনার দুর্গের কর্তৃত্ব লাভ করেন। শেরখানের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে চুনার দুর্গ অবরোধ করেন।

কিন্তু অত্যন্ত কূটকৌশলী এবং রাজনীতিতে দূরদর্শী শেরখান হুমায়ুনের মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করলে তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। ইতবৎসরে শেরখানের উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্খিত হয়ে বিহারের অভিজাত শ্রেণি ও শাসক জালালখান বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের সহায়তায় শেরখানকে দমন করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত বাহিনী এবং শের শাহের নেতৃত্বে আফগান বাহিনীর মধ্যে মুঙ্গেরের নিকটবর্তী কিউল নদীর তীরে অবস্থিত সুরুজগড় নামক স্থানে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সংঘটিত এই যুদ্ধে বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত বাহিনীকে শের খান শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর শের খান প্রকৃতপক্ষে বিহারের অবিসংবাদিত অধিপতি হিসেবে আবির্ভূত হন। শেরখান বাংলার শাসনকর্তা মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে অগ্রসর হলে দুর্বল শাসক মাহমুদ শাহ তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং কিউল হতে সকরিগিলি পর্যন্ত অঞ্চলটি শের খানের অধীনে ন্যস্ত করে নিজে সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। শেরখান ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে পুনরায় বাংলা আক্রমণ করে রাজধানী গৌড় অবরুদ্ধ করলেন। এ সময়কালে সম্রাট হুমায়ুন গুজরাট অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। শেরখানের উত্তরোত্তর ও ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে তিনি গুজরাট অভিযান অসম্পন্ন রেখে সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন। সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শেরশাহের প্রধান ঘাঁটি চুনার দুর্গ অবরুদ্ধ করেন। এটি ছিল সম্রাটের

অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে শেরখান ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে গৌড় জয় করেন এবং একই সাথে গৌড়ের শাসক সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। এছাড়াও তিনি রোটাস দুর্গটি ও দখল করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে সম্রাট হুমায়ুন চুনার দুর্গ জয় সম্পন্ন করে বাংলার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু এটি ছিল সম্রাটের একটি বিলম্বিত পদক্ষেপ। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সসৈন্যে গৌড়ে প্রবেশ করেন। গৌড়ের মনোরম আবহাওয়া হুমায়ুনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। তিনি প্রীত হয়ে এর নাম রাখেন জান্নাতাবাদ। অত্যন্ত কুশলী এবং দূরদর্শী শেরখান সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়ে হুমায়ুনকে গৌড় দখল করার সুযোগ দেন এবং স্বয়ং অগ্রসর হয়ে সমগ্র বিহার দখল করেন। তিনি এমনকি জৌনপুর ও কনৌজ অধিকার করে হুমায়ুনের বাংলা থেকে আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করে দেন।

**চৌসার যুদ্ধ (১৫৩৯)**

সম্রাট হুমায়ুন গৌড় পরিত্যাগ করার পূর্বে জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাংলার শাসনভার অর্পণ করেন। হুমায়ুন তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে বক্সারের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে শেরখান ও তাঁর আফগান অনুচরেরা সম্রাট হুমায়ুনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন চৌসায় উভয়পক্ষের মধ্যে এক তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে চৌসার যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে হুমায়ুন শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। শেরখানের নেতৃত্বে আফগান বাহিনী মুঘল বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। অনেক সৈন্য অনন্যোপায় হয়ে গঙ্গা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এতে অনেকেরই সলিল সমাধি ঘটেছিল নিজাম নামের এক ভিস্তিওয়ালার সাহায্যে সম্রাট হুমায়ুন জীবন রক্ষা করলেন। চৌসার যুদ্ধে শের খানের জয়লাভ ভারতীয় উপমহাদেশে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা এর ফলে শের খানের রাজ্য পশ্চিম দিকে কনৌজ হতে পূর্বে আসাম ও চট্টগ্রাম এবং উত্তর দিকে রোটাস হতে দক্ষিণ দিকে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এই যুদ্ধের পর শেরখান শেরশাহ উপাধি ধারণ করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন ও পাঠের নির্দেশ প্রদান করেন। পক্ষান্তরে এই যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়ের মাধ্যমে মুঘলদের সামরিক ও কূটনৈতিক দুর্বলতা প্রস্ফুটিত হয়।

**কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ (১৫৪০)**

চৌসার যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি দূরীভূতকরণ এবং হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার মানসে সম্রাট হুমায়ুন পুনরায় সৈন্যবাহিনী সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। এসময় তিনি নিজ ভ্রাতাদের কাছে প্রয়োজনীয় সৈন্য সাহায্যের আবেদন করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে সম্রাট হুমায়ুন গোলন্দাজ বাহিনীসহ এক বিশাল সেনাবাহিনী সহকারে শেরশাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে কনৌজের নিকটবর্তী বিলগ্রাম নামক স্থানে মুঘল ও আফগান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ উপমহাদেশের ইতিহাসে কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে শের শাহের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৫ হাজার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সম্রাট হুমায়ুন এই যুদ্ধেও আফগানদের হাতে পরাজিত হন। কনৌজের যুদ্ধের মর্মান্তিক পরাজয়ের পর সম্রাট হুমায়ুন আশ্রয়ের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। অবশেষে পারস্যের শাসক শাহ তাহমাসপের রাজ দরবারে আশ্রয় লাভ করেন এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। এই যুদ্ধে শের শাহের জয়লাভের ফলে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের সাময়িক অবসান ঘটেছিল। শেরশাহ ভারতবর্ষে আফগান শূরী বংশের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করলেন।

**শেরশাহের সাফল্য ও হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণঃ**

শেরশাহের সাফল্য ও হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে উল্লেখ করা যায়।

**প্রথমত; সম্রাট হুমায়ুনের অদূরদর্শিতা**

শেরশাহের নিকট হুমায়ুনের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হলো সম্রাটের অদূরদর্শিতা। পিতা সম্রাট বাবরের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী হুমায়ুন সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পর তাঁর অপর তিন ভ্রাতা কামরান, আসকারী ও হিন্দাল এবং নিজ পিতৃব্যপুত্র সোলেমান মীর্জার মধ্যে সাম্রাজ্য বন্টণ করে রাজনৈতিক অপরিপক্বতার প্রমাণ দেন। চৌসার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সম্রাট হুমায়ুন যখন কনৌজের যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য নিজ ভ্রাতাদের নিকট সৈন্য সাহায্য কামনা করেন তখন তিনি তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন। ফলশ্রুতিতে সম্রাট হুমায়ুন শেরশাহের নিকট পরাজিত হয় এবং দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

**দ্বিতীয়ত; সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব**

সুষ্ঠু এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব সম্রাট হুমায়ুনের ব্যর্থতার আরেকটি কারণ। একজন সুদক্ষ এবং নির্ভীক যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সুপরিকল্পনার বড়ই অভাব ছিল। তিনি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী গুজরাটের বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অযথা সময় নষ্ট করেন। অথচ শের শাহের শক্তিবৃদ্ধির বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। চুনার দুর্গ জয়ের পর সম্রাট হুমায়ুন দীর্ঘ সময় নষ্ট করেন। বাংলাকে 'জান্নাতাবাদ' নামকরণ করে তিনি বাংলায় প্রায় ৮ মাস আরাম-আয়েশে ডুবে থাকেন। এমনি পরিস্থিতিতে দূরদর্শী শেরশাহ চুনার দুর্গ পুনরায় দখল করে বেনারস, জৌনপুর ও কনৌজ পর্যন্ত গমন করেন।

**তৃতীয়ত; সুযোগ্য সেনাবাহিনীর অভাব**

সম্রাট হুমায়ুন শেরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করেন। যারা ছিল যুদ্ধ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ এবং অনুপযুক্ত। মুঘল সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন জাতির লোকদের সংমিশ্রণে। যাদের মাঝে ছিনা ছিল কোনো একতা, না ছিল কোন নিয়মশৃঙ্খলা। অন্যদিকে শেরশাহের নেতৃত্বে আফগান সৈন্যবাহিনী ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, একতাবদ্ধ এবং সর্বোপরি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ।

**চতুর্থত; স্বীয় ভাইদের বিশ্বাসঘাতকতা**

সম্রাট হুমায়ুন ছিলেন সহজ সরল মানুষ তিনি ভ্রাতৃদের প্রতি বিশেষভাবে স্নেহপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু চরম বিপদের সময়েও হুমায়ুন তাদের কাছ থেকে কোনোরূপ সাহায্য সহযোগিতা পান নি। উপরন্তু সম্রাট হুমায়ুন নিজ ভ্রাতাদের বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকার হন। এছাড়াও হুমায়ুন আত্মীয়-স্বজনদের ও বিরোধিতার সম্মুখীন হন। অন্যদিকে শেরশাহ ছিলেন আফগান জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে আফগানরা শের শাহকে পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা এবং একনিষ্ঠ সমর্থন প্রদান করেন।

**পঞ্চমত; হুমায়ুনের চারিত্রিক দুর্বলতা**

সম্রাট হুমায়ুনের চারিত্রিক দুর্বলতা তাঁর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। দূরদর্শী রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার অভাব, মানুষকে অহেতুক বিশ্বাস করা, হেরেমের সুখে গা ভাসিয়ে দেওয়া এবং অতিরিক্ত পরিমাণ আফিম সেবন প্রভৃতি চারিত্রিক দুর্বলতা সম্রাট হুমায়ুনের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এসব চারিত্রিক দুর্বলতার ফলে তিনি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অসমর্থ ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং কূটকৌশলের অধিকারী শের শাহের মৌখিক আনুগত্যকে বিশ্বাস স্থাপনের কারণেই সম্রাট হুমায়ুন পর পর দু'টি যুদ্ধ যথাক্রমে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের চৌসার যুদ্ধ এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

**ষষ্ঠত; শেরশাহের যোগ্যতা**

শেরশাহ ছিলেন সমসাময়িককালের অন্যতম যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। নিঃসন্দেহে তিনি হুমায়ুন অপেক্ষা অধিক যোগ্য ছিলেন। রাজনৈতিক মেধা, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা এবং সামরিক নৈপুণ্যতার কারণেই শেরশাহ সফল হতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে শেরশাহ অপেক্ষা সম্রাট হুমায়ুন ছিলেন তুলনামূলকভাবে কম যোগ্যতাসম্পন্ন শাসক। কাজেই শেরশাহের নিকট সম্রাট হুমায়ুনের পরাজয় যুগের মাপকাঠিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয় হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

**সম্রাট হুমায়ুনের চরিত্র**

সম্রাট নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন ছিলেন একজন আদর্শস্থানীয় পুত্র, স্বামী, পিতা ও ভ্রাতা। তিনি ভ্রাতাদের ক্রমাগত বিরোধিতা সত্ত্বেও কখন ও তাদের প্রতি রুষ্ট হননি। নম্রতা, বদান্যতা, মহানুভবতা এবং উদারতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অনন্য। সম্রাট হুমায়ুন ছিলেন বিভিন্ন প্রতিভার অধিকারী। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হুমায়ুন জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র এবং কাব্য চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। সম্রাট বাবরের ন্যায় তাঁর পুত্র সম্রাট হুমায়ুনও সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারতেন। হুমায়ুন ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের একজন পৃষ্ঠপোষক। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, "হুমায়ুন আলেকজাণ্ডারের ন্যায় উদ্যমী ও এরিস্টটলের ন্যায় জ্ঞানী ছিলেন।" খুদামীর, সাহাবউদ্দিন, কাফা, জৌহর প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তি তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্য ও চিত্রকলার উৎকর্ষ সাধিত হয়। পারস্য থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি মীর সৈয়দ আলী এবং খাজা আব্দুস সামাদকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল চিত্রকলার শুভ সূচনা হয়েছিল। নিষ্ঠাবান মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হুমায়ুন কখনও ধর্মান্ধ ছিলেন না। নি:সন্দেহে হুমায়ুন একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। পিতা জহিরউদ্দিন মুহম্মদ

বাবরের সাথে হুমায়ুন ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের পানি পথের প্রথম যুদ্ধ এবং ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের খানুয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের পরিচয় দেন। এছাড়াও তিনি গুজরাট ও মালব হয়। সঠিক পরিকল্পনা এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতার দরুণ হুমায়ুন চৌসা এবং কনৌজের যুদ্ধে শেরশাহের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। শাসক হিসেবে হুমায়ুন বিশেষ কোনো কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। কেননা ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে পিতা বাবরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব রক্ষায় তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হন। ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যে একটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | **শেরশাহের সাফল্য ও হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণগুলো লিখুন।** |
|---|---|

## সারাংশ

সম্রাট জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর মাত্র ২৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আফগান নেতা শেরশাহের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের চৌসার যুদ্ধ এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট শোচনীয়তাভাবে পরাজিত হয়। কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর হুমায়ুন পারস্যের শাসক শাহ তাহমাস্পের রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১৫ বছর পর ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পারস্যের শাসকের সহায়তায় মুঘল সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তিনি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পরে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। নি:সন্দেহে হুমায়ুন ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

### বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের সময় হুমায়ুনের বয়স ছিল-
ক. ২১ বছর খ. ২২ বছর গ. ২৩ বছর ঘ. ২৩ বছর

২। চুনার দুর্গ অবস্থিত-
ক. পদ্মার তীরে খ. যমুনার তীরে গ. বুড়িগঙ্গার তীরে ঘ. গঙ্গার তীরে

৩। মান্দাসোর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল-
ক. ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে গ. ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে

৪। গৌড়ের নাম 'জান্নাতাবাদ' রাখেন-
ক. বাহাদুর শাহ খ. মাহমুদ শাহ গ. হুমায়ুন ঘ. শেরশাহ

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্নঃ**

শামসুজ্জামান বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর ভ্রাতাদের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার অর্পন করেন। তিনি নিজ কার্যের দ্বারা নিজেই নিজের হস্তকে দুর্বল করেন। শূর বংশের শাসকের সাথে তার বিভিন্ন কারণে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে যেটি ইতিহাসে তাকে ভাগ্য বিড়ম্বনার সাক্ষ্য করে তোলে।

১. মুঘল বংশের দ্বিতীয় শাসকের নাম কি? ১
২. চৌসার যুদ্ধের বর্ণনা দিন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে শূর বংশের শাসকের দ্বন্দ্বের পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করুন। ৩
৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক ছিলেন ইতিহাসে 'ভাগ্যবিড়ম্বনার সাক্ষ্য' এ মতের পক্ষে আপনার যুক্তি দিন। ৪

# পাঠ-৩.৩ শূর বংশঃ শেরশাহের রাজ্য বিজয় ও শাসন সংস্কার

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- শূর বংশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শেরশাহের শাসন সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | **পরগণা, কবুলিয়ত, পাট্টা, রায়তওয়ারী, তঙ্কা, দাম, গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড, ডাক-চৌকি ও হুলিয়া** |

### শূর বংশ

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে শূর বংশের রাজত্বকাল (১৫৪০-১৫৫৫ খ্রি.) স্বল্প সময়ের হলেও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুঘল বংশের দ্বিতীয় সম্রাট নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন ছিলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল চিত্তের শাসক। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত চৌসার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর হুমায়ুন ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে ৩০,০০০ সৈন্য নিয়ে কনৌজের সন্নিকটে বিলগ্রাম নামক স্থানে শের শাহের মাত্র ১৫,০০০ সৈন্যের সম্মুখীন হন। কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন। ফলে জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষে মুঘল বংশের সাময়িক পতন ঘটে। শেরশাহ ভারতবর্ষে শূর শাসন প্রবর্তন করে পুনরায় আফগান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের চৌসার যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরখান 'শাহ' (সম্রাট) উপাধি গ্রহণ করে প্রকাশ্যভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর পর তিনি নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা অঙ্কনের নির্দেশ জারি করেন। বিজয়-অভিযান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন। কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার কালে বারুদ্দের গুদামে আকস্মিক বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২২মে শেরশাহ মৃত্যুবরণ করেন। শেরশাহের আকস্মিক মৃত্যুর পর ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জালাল খান ইসলাম শাহ' উপাধি ধারণ পূর্বক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইতিহাসে সাধারণত 'সলিম শাহ' নামে পরিচিত। ইসলাম শাহ ছিলেন সুশিক্ষিত, সাহসী ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক। পিতা শেরশাহের রাজত্বকালে তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

ইসলাম শাহের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা খাক্কারদের ধ্বংসসাধন। কিন্তু অভিজাতদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করার কারণে তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে ইসলাম শাহ ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র ফিরোজ শাহ মাত্র বার বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ফিরোজ শাহের মামা মুবারিজ খান তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। অতঃপর মুবারিজ খান 'মুহম্মদ আদিল শাহ' উপাধি ধারণ করে দিল্লির শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু দুর্বল ও অকর্মণ্য আদিল শাহে স্বৈরশাসনে রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। প্রাদেশিক শাসকগণ নিজ নিজ প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এমনি পরিস্থিতিতে শূর পরিবারের ইব্রাহিম খাঁ শূর আদিল শাহকে পরাস্ত করে আগ্রা ও দিল্লি দখল করেন। এসময় আদিল শাহ অনন্যোপায় হয়ে চুনারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবের শাসক সিকান্দার শাহ ইব্রাহিম খাঁ শূরকে বিতাড়িত করে দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও আফগান নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক কলহ বিবাদের সুযোগে হুমায়ুন তাঁর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য মনঃস্থ করেন। তিনি ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে কাবুল থেকে ভারত অভিযানে রওয়ানা দেন। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে শাসক সিকান্দার শাহকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। ফলে ভারতে শূর বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

### শেরশাহের শাসন সংস্কার

শেরশাহ মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ শাসন সংস্কারক। শেরশাহের চরিত্রে সামরিক নিপুণতার সাথে সুষ্ঠু শাসন দক্ষতার যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তার দৃষ্টান্ত অপ্রতুল। শেরশাহের শাসন ব্যবস্থায় ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দু ও মুসলিম শাসন পদ্ধতির মৌলিক নীতির এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। শেরশাহ মূলত সাম্রাজ্যে জনকল্যাণমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেন।

**প্রশাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ**

শেরশাহ দক্ষ, প্রগতিশীল ও প্রজাকল্যাণমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে শেরশাহ সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সরকারে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করেন শেরশাহ। ঐতিহাসিকদের মতে, শের শাহের সাম্রাজ্যে মোট ১,১৩,০০০ পরগণা ছিল। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম শাসন ইউনিট ছিল গ্রাম। শেরশাহ প্রত্যেক পরগণায় একজন করে শিকদার, আমীন, মুনসিফ, খাজাঞ্চী বা কোষাধ্যক্ষ, দুইজন কারকুন-একজন হিন্দু ও আর একজন ফারসী হিসাব লেখক নিযুক্ত করেন। প্রত্যেক সরকারে শিকদার-ই-শিকদারান ও মুনসিফ-ই-মুনসিফান নামক দু'জন সর্বোচ্চ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা পরগণাগুলোর শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতেন।

**রাজস্ব সংস্কার**

শেরশাহ রাজস্ব সংস্কার সাধন করে মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে শেরশাহ সর্বপ্রথম সমস্ত আবাদী জমির নির্ভুল জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অত:পর জমির উৎপাদন শক্তির তারতম্য অনুসারে রাজস্ব নির্ধারণ করেন। সাধারণত উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল। উৎপন্ন শস্যে কিংবা নগদ অর্থে কৃষকরা রাজস্ব প্রদান করতে পারত। রাজস্ব আদায়ের জন্য শেরশাহ পাটোয়ারী, চৌধুরী, মুকাদ্দাম প্রভৃতি পদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করেন।

শেরশাহ

শেরশাহ সর্বপ্রথম 'কবুলিয়ত ও পাট্টা' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কৃষকরা জমির উপর তাদের অধিকার, দায়িত্ব ও নির্ধারিত কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, কবুলিয়ত নামক দলিল সম্পাদন করে দিত। আর সরকারের পক্ষ থেকে জমির উপর কৃষকের স্বত্ব ও কর স্থির করে পাট্টা' প্রদান করা হত। 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' ব্যবস্থা প্রবর্তন করে শেরশাহ ভারতবর্ষে প্রকৃত পক্ষে আধুনিক রাজস্ব-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। বলা হয়ে থাকে যে, সম্রাট আকবরের ভূমি বন্টন ও রাজস্ব নীতি এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে 'রায়তওয়ারী' বন্দোবস্ত' প্রথা বহুলাংশে শেরশাহ প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে গড়ে ওঠেছিল।

**শুল্ক ও মুদ্রানীতির সংস্কার**

শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি বিধানের জন্য শেরশাহ আন্ত:প্রাদেশিক শুল্ক উঠিয়ে দেন। তিনি অবাঞ্ছিত শুল্ক কর রহিত করে বিক্রয় কেন্দ্রে অথবা সীমান্তে শুল্ক কর ধার্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শেরশাহের শাসনামলে ভারতে বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন পরিমাপের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ফলে মুদ্রা ব্যবস্থায় কেন জটিলতা দেখা দেয়। এই সংকট নিরসনকল্পে শেরশাহ পুরানো এবং মিশ্র ধাতুর প্রচলিত মুদ্রাগুলো বাতিল ঘোষণা করে মুদ্রার আকৃতি, মূল্যমান ও পরিমাপের বৈষম্য দূরীভূত করে রূপার তৈরি তঙ্কা' এবং তামার তৈরি 'দাম' নামে এক নব মুদ্রার প্রচলন করেন। এছাড়াও শেরশাহ ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিময় ব্যবস্থা সহজ করার জন্য আধুলি, সিকি, দু-আনি ও এক-আনি খুচরা মুদ্রার প্রচলন করেন। শেরশাহ প্রবর্তিত মুদ্রা ধাতুর বিশুদ্ধতায়, সৌন্দর্যে, অক্ষরের স্পষ্টতায় ও মুদ্রামানের উৎকর্ষতায় ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসে অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ প্রবর্তিত মুদ্রা উপমহাদেশে আদর্শ মুদ্রার স্থান লাভ করেছিল।

**যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন**

শেরশাহের শাসনামলে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং সর্বত্র যাতায়াতের সুবিধার জন্য শেরশাহ অনেক সুন্দর সুন্দর ও প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করেন। শেরশাহ নির্মিত সড়কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল 'গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড'। এই সড়কটি বর্তমান বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে আগ্রা হয়ে দিল্লি এবং পাঞ্জাব হয়ে সিন্ধু পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ ক্রোশ ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। এছাড়াও শেরশাহ পথিকদের সুবিধার জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপন এবং দুই ক্রোশ অন্তর এক একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। এতদ্ব্যতীত শেরশাহ দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য 'ঘোড়ার ডাক'এর প্রচলন কয়েন। যা সাধারণত 'ডাক-চৌকি' নামে সুপরিচিত।

**সামরিক সংস্কার**

শেরশাহের পূর্ববর্তী শাসকগণ সাধারণত সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৈন্য সরবরাহ পেতেন। কিন্তু শেরশাহ এই সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতির মূলোৎপাটন করে আলাউদ্দিন খলজির অনুকরণে স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। শেরশাহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির লোকদের সমন্বয়ে এক বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তুলেন এবং স্বয়ং এর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। আফগানরাই ছিল সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড। শেরশাহের সেনাবাহিনীতে পঁচিশ হাজার পদাতিক, দেড়লক্ষ অশ্বারোহী, তিনশত হস্তী বাহিনী এবং বিপুল সংখ্যক গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। সেনাবাহিনীকে তিনি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। শেরশাহের সামরিক নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রিয় সরকারের সাথে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন। শেরশাহ জায়গীর প্রথার বিলুপ্তি সাধন করে সৈন্যদেরকে নিয়মিত বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সেনাবাহিনীর দুর্নীতি ও অবৈধ কার্যকলাপ কঠোর হস্তে দমনের উদ্দেশ্যে শেরশাহ সুলতান আলাউদ্দিন খলজির অনুকরণে 'দাগ' বা চিহ্নিত করণ ও হুলিয়া' অর্থাৎ সৈন্যদের বিবরণমূলক তালিকা সংরক্ষণ পদ্ধতি চালু করেন।

**বিচার ব্যবস্থার সংস্কার**

শেরশাহ বিচার ব্যবস্থায় মানবোচিত সংস্কার সাধন করেন। তিনি সাম্রাজ্যে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বিচার ব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলিম, ধনী-দরিদ্র পার্থক্য দূরীভূত করে আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এই নীতিতে বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হত। শেরশাহের শাসনামলে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ন্যায়বিচার পেতেন। শেরশাহ এমনকি তার অপরাধী নিকট আত্মীয়-স্বজনকেও বিচারের আওতায় আনতে কুণ্ঠিত হতেন না। প্রত্যেক পরগণার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ভার কাজী ও মীর আদল উপাধিধারী কর্মচারীদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল। হিন্দুদের পৈতৃক বিষয় বা অধিকার সংক্রান্ত বিবাদ তথা দেওয়ানী মামলা তাদের পঞ্চায়েতেই নিষ্পত্তি করা হত। কিন্তু ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে তাদের সাধারণ-বিচারালয়ের শরণাপন্ন হতে হতো। শেরশাহের শাসনামলে দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম। কয়েকটি পরগণায় উপর একজন করে মুনসিফ-ই-মুনসিফান দেওয়ানী বিচারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ফৌজদারী বিচারের ভার অর্পণ করা হয়েছিল প্রধান কাজী বা কাজী উল কুজ্জাত এর উপর। সর্বোপরি শেরশাহই ছিলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারক।

**ধর্মীয় নীতি**

শেরশাহ ছিলেন নি:সন্দেহে একজন ধর্মভীরু ও ধর্মপরায়ণ আদর্শ মুসলমান। তিনি অন্য ধর্মের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত উদার। তার শাসনামলে সাম্রাজ্যে বসবাসকারী সকল ধর্মের লোকজন ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি সহিষ্ণুতার নিদর্শনস্বরূপ শেরশাহ বহু হিন্দুকে রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। তাঁর অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন ব্রহ্মজিৎ গৌড়।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে শেরশাহের ভূমিকা লিখুন।** |

**সারাংশ**

আফগান জাতির শূর-উপদল ভুক্ত শেরশাহ ভারতীয় উপমহাদেশে শূর বংশ প্রতিষ্ঠা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের মৃত্যুর পর এই বংশ ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ শাসন করেছিল। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শেরশাহ ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাসক। তিনি শাসন ব্যবস্থায় বিবিধ সংস্কার সাধন করে শাসন ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী এবং প্রগতিশীল করে গড়ে তুলেন। শেরশাহের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব তিনি ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে 'কবুলিয়ত ও পাট্টা' নামক এক অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এছাড়াও সৈন্যবাহিনীর দুর্নীতি দূর করার মানসে শেরশাহ সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাগ ও হুলিয়া প্রথা পুন:প্রবর্তন করেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

### বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

### সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন-

ক. শেরশাহ খ. ইসলাম শাহ গ. ফিরোজ শাহ ঘ. মুহম্মদ আদিল শাহ

২। ইসলাম শাহ (জালাল খান) ইতিহাসে সাধারণত পরিচিত-
ক. মুবারক শাহ নামে খ. মহিউদ্দিন শাহ নামে গ. সলিম শাহ নামে ঘ. বুঘরা শাহ নামে

৩। শূর বংশের শাসনের অবসান ঘটে-
ক. ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে গ. ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে

৪। শেরশাহের শাসন ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রতম শাসন ইউনিট ছিল-
ক. সরকার খ. পরগণা গ. গ্রাম ঘ. তালুক

৫। 'কবুলিয়ত ও পাট্টা' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন-
ক. বাবর খ. হুমায়ুন গ. শেরশাহ ঘ. আকবর

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্নঃ**

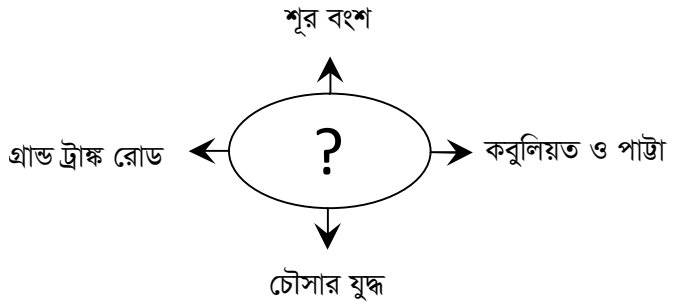


১. শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
২. কবুলিয়ত ও পাট্টা পদ্ধতি সম্পর্কে লিখুন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের রাজস্ব ব্যবস্থা আপনার পাঠ্যবইয়ের আলোকে তুলে ধরুন। ৩
৪. উক্ত শাসকের জনহিতকর কার্যাবলিতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ আপনার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করুন। ৪

# পাঠ-৩.৪ শেরশাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- শেরশাহের চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শেরশাহের কৃতিত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | **শিকদার-ই-শিকদারান, মুনসিক-ই-মুনসিফান, কবুলিয়ত, পাট্টা, রায়তওয়ারী ও তঙ্কা** |

মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইতিহাসে শেরশাহ ছিলেন সুযোগ্য, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাহিতৈষী শাসক। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ শেরশাহকে মধ্যযুগের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন। শেরশাহ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে একজন অসামান্য যুদ্ধকৌশলী, পারদর্শী সমরনায়ক, দ্বিধা-বিভক্ত ও হতাশাগ্রস্ত আফগান জাতির একজন দক্ষ সংগঠক, একজন প্রগতিশীল সংস্কারক এবং প্রজাবৎসল শাসক। ধূমকেতুর ন্যায় ভারতের ভাগ্যাকাশে শেরশাহের আবির্ভাব ঘটে। সামান্য একজন জায়গীরদারের পুত্র হয়ে এবং প্রাথমিক জীবনে বিমাতার গভীর ষড়যন্ত্রে নানামুখী ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েও নিজস্ব মেধা, মনন, প্রতিভা, আত্মবিশ্বাস, বিচক্ষণতা ও কর্মনিপুণতার দ্বারা শেরশাহ ভারতীয় উপমহাদেশে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেরশাহের চরিত্রে আকর্ষণীয় গুণাবলীর এক অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

### রাজনীতিবিদ হিসেবে

শেরশাহ ছিলেন একজন উদারপন্থী এবং আদর্শ রাজনীতিবিদ। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ধর্ম পরায়ণ ছিলেন কিন্তু ধর্মান্ধ ছিলেন না। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও সুলতান মুহম্মদ ঘুরীর ন্যায় শেরশাহ কখনও উলেমা সম্প্রদায় দ্বারা অথবা ধর্মীয় সংকীর্ণতা দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন না। শেরশাহ হিন্দু, মুসলিম, তুর্কি, আফগান, খলজি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও ধর্মবিশ্বাসের লোকদের রাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে উন্নতি বিধানের জন্য শেরশাহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ কার্যকলাপের ফলে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নিকট তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় হেনরীর ন্যায় শেরশাহ সাম্রাজ্যে আইনের রাজত্ব' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। শেরশাহ নিজে আইন মান্য করতেন এবং জনসাধারণকে ও আইন মেনে চলতে বাধ্য করতেন। সম্রাট আকবরের পূর্বে কেবলমাত্র শেরশাহ ছাড়া অন্য কেউ জনসাধারণকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এরূপ আইন প্রণয়ন করতে পারেননি। সম্রাট আকবরের শাসনামলে কয়েকটি আইন শেরশাহের কানুনের আদর্শে গঠিত হয়েছিল।

### সমর-নায়ক হিসেবে

শেরশাহ ছিলেন একজন সুযোগ্য সময় নায়ক। তিনি ছিলেন সামরিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন সুযোগ্য নরপতি। রণচাতুর্য ও ব্যূহ-রচনা কৌশলে নি:সন্দেহে তিনি তুর্কী মুঘলদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। মুঘলদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহে শেরশাহ নজিরবিহীন বীরত্ব ও সামরিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। বাংলা, মালব, বুন্দেল খণ্ড ও রাজপুতনায় অভিযান পরিচালনা করে তিনি সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রদান করেন। সামরিক নেতা শেরশাহের সমরকূটকৌশল ছিল অতুলনীয়। শৌর্য-বীর্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যে শেরশাহ ছিলেন বিশ্ববিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের সমতুল্য। তিনি সৈন্যবাহিনীকে নিয়মিত তদারকি করতেন এবং তাদেরকে নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনে উদ্দীপ্ত করতেন।

### শাসক হিসেবে

শেরশাহ ছিলেন একজন সুযোগ্য প্রশাসক। তাঁর শাসন নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর সুষ্ঠু, সুদৃঢ় ও জনহিতকর করে গড়ে তোলা। শেরশাহ বিজ্ঞানসম্মত এবং জনকল্যাণমূলক রাজস্বনীতি গ্রহণ করেছিলেন। শেরশাহ অত্যন্ত দূরদর্শী শাসক ছিলেন। ইতিপূর্বে প্রচলিত ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শাসন-প্রণালীর শ্রেষ্ঠ নীতিগুলি গ্রহণ করে নিজস্ব মেধা-মনন, প্রতিভা ও উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে এক অনুপম শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে মুঘল

সম্রাট আকবর শেরশাহের শাসন প্রণালী দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন। শেরশাহ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক প্রত্যাহার, সামরিক বাহিনীর উন্নতি বিধান, পুলিশ ও গুপ্তচর ব্যবস্থার সংগঠন, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন, ঘোড়ার ডাক প্রচলন, ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করে একটি গতিশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

**জাতি গঠনকারী হিসেবে**

শেরশাহ বিভিন্ন মতবাদের অনুসারীদের নিয়ে একটি 'ভারতীয় জাতি' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শেরশাহের উদ্দেশ্য ছিল সকল ধর্ম ও মতবাদের লোকদের সমন্বয়ে তাদের ঐকান্তিকতা ও সাহায্য সহযোগিতার ভিত্তিতে এক বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা শেরশাহের চিন্তা ও স্বপ্ন পরবর্তীকালে সম্রাট আকবরের কর্মের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করে। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য শেরশাহ নিরলসভাবে কাজ করে জাতি গঠনের প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত করেন।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | **একটি 'ভারতীয় জাতি' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শেরশাহ-ব্যাখ্যা করুন।** |
|---|---|

**সারাংশ**

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসক শেরশাহ ছিলেন অন্যতম আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। তিনি মুঘল বংশের দ্বিতীয় সম্রাট হুমায়ুনকে কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত এবং বিতাড়িত করেন। শেরশাহের রাজত্ব কাল মাত্র পাঁচ বছর (১৫৪০-১৫৪৫) স্থায়ী হয়েছিল। এই স্বল্প সময়ের রাজত্বকালে শেরশাহ নিজেকে একজন সুযোগ্য শাসক হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

### বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

### সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শেরশাহ বিভিন্ন মতবাদের অনুসারীদের নিয়ে গঠন করতে চেয়েছিলেন-
ক. একটি আফগান জাতি খ. একটি পাকিস্তানি জাতি গ. একটি ভারতীয় জাতি ঘ. একটি মুসলমান জাতি

২। শেরশাহের পিতা ছিলেন একজন-
ক. রাজস্ব কমকর্তা খ. জায়গীরদার গ. সাধারণ সৈনিক ঘ. রাজগৃহাধ্যক্ষ

৩। শেরশাহ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন-
ক. মাত্র ৩ বছর খ. মাত্র ৪ বছর গ. মাত্র ৫ বছর ঘ. মাত্র ৬ বছর

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্নঃ**

শাকিল মাহমুদ বহুবিধ ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে জীবনের পথে অগ্রসর হয়ে ভারত সম্রাটের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি মুঘল বংশের অন্তর্বর্তী একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির উপর তার ধর্মনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি স্বৈরাচারী হলেও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। বহুবিধ জনহিতকর কার্যাবলির জন্যও তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

১. কত সালে শূর বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
২. গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড সম্পর্কে লিখুন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের চরিত্র ও কৃতিত্ব তোমার পাঠ্যবইয়ের যে শাসকের সাথে সম্পৃক্ত তা বর্ণনা করুন। ৩
৪. আপনি কি মনে করেন, উক্ত শাসক ছিলেন সম্রাট আকবরের অগ্রদূত? আপনার মতের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরুন। ৪

# পাঠ-৩.৫ সম্রাট আকবর; রাজ্যবিজয়, ধর্মনীতি ও রাজপুত নীতি

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- আকবরের রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আকবরের ধর্মনীতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- আকবররের রাজপুত নীতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | **দ্বীন-ই-ইলাহী, রাজপুত, ইবাদাতখানা, চাঁদ সুলতানা ও দাক্ষিণাত্য** |

## সম্রাট আকবর

সম্রাট আকবর ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। যুদ্ধক্ষেত্র, সমরনীতি, কূটনীতি ও প্রশাসন সকল ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মুঘলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। ইতিহাসে তাই তিনি 'Akbar the Great' নামে পরিচিত। সম্রাট হুমায়ুন যখন শেরশাহ এর নিকট পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়ে স্ত্রী হামিদাবানুকে নিয়ে পারস্য অভিমুখে যাত্রাকালে, রাজস্থানের অমরকোটে ২৩ নভেম্বর, ১৫৪২ সালে আকবর জন্মলাভ করেন। জন্মের পর হুমায়ুন শিশুপুত্রের নামকরন করেন জালালউদ্দিন। প্রথমে কয়েকবছর আকবর তার চাচা হিন্দাল, শামছুদ্দিন খান ও মাহম আনগার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। হুমায়ুন তার পুত্রের প্রথাগত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। আকবর খুব অল্প বয়সেই মল্লযুদ্ধ, অশ্বচালনা, তীরন্দাজ ইত্যাদি যুদ্ধকৌশল সহজেই রপ্ত করেন। ১৫৫১ খ্রি: মাত্র ৯ বছর বয়সে সম্রাট আকবর তার চাচা হিন্দালের কন্যা রুকাইয়া বেগমকে বিবাহ করেন।

## সিংহাসন আরোহণ

১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিনি খুব বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেননি। ১৫৫৫ খ্রি: আগ্রার লাইব্রেরির সিড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর প্রাক্কালে আকবর পাঞ্জাবে বৈরামখানের তত্ত্বাবধানে অবস্থান করছিলেন। বৈরাম খান এখানেই আকবরকে পরবর্তী মুঘল সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তার রাজ্য অভিষেকের ব্যবস্থা করেন। ১৫৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জালালউদ্দিন মুহাম্মদ আকবর উপাধি নিয়ে মাত্র ১৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিশ্বস্ত বৈরাম খান আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং ১৫৬০ খ্রি: পর্যন্ত সম্রাট আকবর বৈরাম খানের তত্ত্বাবধানে রাজ্যশাসন করেন।

## রাজ্যবিজয়

শেরশাহের মৃত্যু ও হুমায়ুনের সিংহাসন পূনরূদ্ধারের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতে এক বিশৃংখল রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল। শুর বংশীয় সিকান্দার শুর পাঞ্জাবে এবং আদিল শাহ শুর উত্তর ভারতে শক্তি সঞ্চয় করে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরোধীতা করতে থাকে। মেবার, বুন্দি, সিন্ধু, গুজরাট, মুলতান মালব ও যোধপুর ইত্যাদি রাজ্য দিল্লির নিয়ন্ত্রণকে প্রত্যাখান করেছিল। একইভাবে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহ গোলকুন্ডা, বিদর, বিজাপুর, আহমেদনগর মুঘল শাসনকে অবহেলা করছিল। এই সকল পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে সম্রাট আকবর রাজ্যবিস্তারে বদ্ধপরিকর হন। সম্রাট আকবরের রাজ্য বিজয়ের বিবরণ নিম্নরূপ:

### পানিপথের ২য় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রি.)

রাজ্যবিস্তারের প্রথম ধাপে আকবর আদিল শাহ শুরের সেনাপতি ও প্রধানমন্ত্রী হিমুর মুখোমুখি হন। হিমু হুমায়ুনের মৃত্যুর পর দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে বিক্রমাদিত্য উপাধি নিয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন। আকবরের সাথে হিমুর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। বৈরাম খান মুঘল বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর পানিপথের প্রান্তরে হিমুকে পরাজিত করেন। যুদ্ধের সময় হিমুর একটি চোখে তীর বিদ্ধ হয় এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়।

পানিপথের ২য় যুদ্ধ মুঘল ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এই যুদ্ধ বিজয়ের মাধ্যমে মুঘলরা হারানো আত্মবিশ্বাস খুজে পায় এবং ভারতে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরে আসে।

**আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযান**

পানিপথের যুদ্ধে বিজয়ের পর আকবর পাঞ্জাবের আফগান নেতা সিকান্দার শাহ শুরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। মানকোট দুর্গে সিকান্দার শুরের পতন ঘটে। আদিল শাহ শুর ১৫৫৭ খ্রি. মুঙ্গেরে নিহত হন এবং অপর আফগান নেতা ইব্রাহিম শুর উড়িষ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।

**মালব ও গন্ডোয়ানা অধিকার (১৫৬১-৬৪ খ্রি.)**

আকবর তার দুধভ্রাতা মাহম আনগার-পুত্র আদম খানের নেতৃত্বে ১৫৬১ খ্রি. মালব অধিকার করেন। ১৫৬৪ সালে আসফ খান মধ্যভারতের চান্দেল বংশীয় রাজা বীর নারায়ন ও রাজমাতা দুর্গাবতীকে যুদ্ধে পরাজিত করে গন্ডোয়ানা রাজ্য অধিকার করেন।

**চিতোর অধিকার (১৫৬৭-৬৮ খ্রি.)**

ভারতের প্রাচীন যোদ্ধাজাতি রাজপুত শক্তি খানুয়ার যুদ্ধে ১৫২৭ খ্রি. চিরতরে শেষ হয়ে যায়নি। রাজপুত রাজাদের মধ্যে শক্তিশালী ও উদ্ধত প্রকৃতির রাজা ছিলেন উদয় সিংহ। তিনি মালবের রাজা রাজবাহাদুরকে আশ্রয় দিয়ে এবং আকবরের বৈমাত্রেয় ভাই মীর্জা হাকিমকে সাহায্য করে আকবরের বিরাগজাজন হন। ১৫৬৮ খ্রি. আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন। রাজা উদয়সিংহ পালিয়ে যান কিন্তু তার সেনাপতি জয়মল ও পাট্টা প্রায় চারমাস যুদ্ধ করে পরাজিত হন। অবশেষে চিতোর মুঘল অধিকারে আসে।

আগ্রা দুর্গ

**রণথম্ভোর ও কালিঞ্জর বিজয়**

রনথম্ভোরের রাজা ছিলেন চৌহান বংশীয় সুরজন। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে আকবরের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা সুরজন আকবরের সাথে একটি সন্ধি করেন। আকবর তাকে দুইহাজারী মনসব প্রদান করেন এবং বারানসী ও চুনারের শাসক নিয়োগ করেন। সুরক্ষিত কালিঞ্জর দুর্গের অধিপতি ছিলেন রাজা রামচন্দ্র। আকবরের আক্রমনে রাজা রামচন্দ্র ১৫৬৯ খ্রি. মুঘল বাহিনীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন।

**রানা প্রতাপ এর বিদ্রোহ দমন**

মেবারের উত্তরাধিকারী উদস সিংহের পুত্র রানা প্রতাপ সিং মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৫৭৬ সালে গোলকুন্ডার নিকট হলদিঘাটে মুঘল রাজপুত বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রানা প্রতাপ পালিয়ে যান।

**গুজরাট বিজয় (১৫৭২ খ্রি.)**

ভারতের সম্পদশালী ও বাণিজ্যকেন্দ্র গুজরাট সম্রাট আকবরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। গুজরাটের শাসক তৃতীয় মুজাফফর শাহেব দুর্বলতার সুযোগে তার মন্ত্রী ইতিমাদ খান আকবরকে গুজরাট অভিযানের আমন্ত্রণ জানান। আকবর ১৫৭৩ সালে সুরাট দখল করেন এবং আজিজ কোকোকে আহমদাবাদের শাসক নিযুক্ত করেন। গুজরাটের বিদ্রোহী ও পলাতক আমিরগণ সুরাট, ক্যাম্বে ও আহমদাবাদ দখল করলে আকবরও পুনরায় গুজরাট জয় করে টোডরমলকে এর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

**বাংলা বিজয় (১৫৭৬ খ্রি.)**

এই সময় বাংলার শাসক ছিলেন দাউদ খান কররানি। তিনি তার পিতা সুলায়মান কররানীর মত মুঘলদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেননি। তিনি নিজ নামে খুৎবা ও মুদ্রা জারি করেন। আকবর প্রথমে জৈনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খানকে বাংলা আক্রমনের নির্দেশ দেন। দাউদ খানের বিচক্ষণ উজির লোদী খানের মধ্যস্থতায় দাউদখান মুনিম খানের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু ১৫৭৪ খ্রি. আকবর হাজিপুর ও পাটনা অধিকার করেন এবং মুনিম খানকে বাংলার সুবাদার ও টোডরমলকে বাংলা অভিযান এর দায়িত্ব অর্পন করে রাজধানীতে ফিরে যান। মুঘল বাহিনী একে একে ভাগলপুর, কোলগাও, তেলিয়াগিরি হয়ে তান্ডা ও সপ্তগ্রাম অধিকার করে। মুঘলদের সাথে দাউদ খান ১৭৫৭ খ্রি. কটকের সন্ধি স্থাপন

করে। অবশেষে রাজা টোডরমল ও হোসেন কুলি খান-এর নেতৃতে ১৫৭৬ খ্রি. ১০ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলা বিজয় সম্পন্ন হয়।

**কাবুল, কাশ্মীর ও কান্দাহার বিজয়**

আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মির্জা হাকিম আগ্রার সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলে আকবর ১৫৮১ খ্রি. মির্জা হাকিমকে পরাজিত করে কাবুল অধিকার করেন। অপরদিকে রাজা ভগবান দাস এর নেতৃত্বে কাশ্মীরের শাসক ইউসুফ শাহের বিরুদ্ধে আকবর অভিযান প্রেরণ করেন। ১৫৮৬-৮৭ খ্রি. মধ্যে কাশ্মীর মুঘল অধিকারে আসে। ভৌগালিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন কান্দাহার ১৫৯৫ খ্রি. মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।

**সিন্ধু বিজয় (১৫৯১ খ্রি.)**

আকবর ১৫৯০ সালে মির্জা আব্দুর রহিমকে মুলতানের গভর্ণর হিসেবে প্রেরণ করেন। আব্দুর রহিম ১৫৯১ খ্রি. জানি বেগকে পরাজিত করে সিন্ধু ও বেলুচিস্তান দখল করেন।

**আকবরের দাক্ষিণাত্য নীতি**

উত্তরপূর্ব ও উত্তর পশ্চিম ভারত বিজয়ের পর সম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্যের দিকে নজর দেন। কিন্তু একমাত্র খান্দেশ ব্যতীত অন্যরাজ্যগুলো (আহমেদনগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা) মুঘল আধিপত্য মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৫৯৫ খ্রি. আহমেদ নগরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। আহমেদ নগরের শাসক বাহাদুর নিজাম শাহের অভিভাবিকা বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানা ১৫৯৬ খ্রি. সন্ধি স্থাপন করেন। ১৬০১ খ্রি. মুঘল বাহিনীর নিকট আসিরগড় দুর্গের পতন ঘটে। এতে বুরহানপুরসহ খান্দেশ রাজ্যের পতন ঘটে।

**আকবরের ধর্ম নীতি**

আকবর তার শাসনকালে ধর্মীয়ক্ষেত্রে নতুন নীতি প্রবর্তনের কারণে ইতিহাসে তিনি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছেন। আকবর নিজে সুন্নী ধর্মাবলম্বী হলেও তিনি 'দ্বীন-ই-ইলাহি' নামক এক নতুন ধর্মমত প্রচলন করতে সচেষ্ট হন। তাই আকবরের ধর্মীয় নীতি মূলত দ্বীন-ই-ইলাহীকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে।

**দ্বীন-ই-ইলাহী**

সম্রাট আকবর ১৫৮২ খ্রি. দ্বীন-ই-ইলাহী নামক এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। প্রকৃত অর্থে এটি ছিল একটি ভ্রাতৃত্বের সংঘ। আকবর ফতেহপুর সিক্রিতে একটি ইবাদাতখানা তৈরী করেন। এখানে হিন্দু পন্ডিত, আলেম-উলেমা, জেসুইট মিশনারী ও অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকতেন ও তাদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতেন। আকবর সকলের মতামত মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং এই সকল ধর্মের দ্বন্দ্বকে একপাশে রেখে সকল ধর্মের ভাল দিকগুলো একত্রিত করে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। এটিই দ্বীন-ই-ইলাহি নামে পরিচিত। আকবর নিজে 'ইমাম-ই-আদিল' উপাধি গ্রহণ করেন। সম্রাটের ধর্মনীতির মূল কথাই ছিল পরধর্ম সহিষ্ণুতা বা "সুলহ-ই-কুল"। প্রতি রবিবার সম্রাট নিজে এই ধর্মের দীক্ষা দিতেন। এর কতগুলো নিয়ম ও আচার পদ্ধতি ছিল। এই ধর্মের অনুসারীদের চারটি জিনিস যথা ধন, জীবন, সম্মান এবং ধর্ম উৎসর্গ করতে হত। স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেকে দ্বীন-ই-ইলাহীর প্রতি আকৃষ্ট হলেও এটি জনসাধারনের মাঝে জনপ্রিয় হতে পারেনি। হিন্দু রাজা বীরবলসহ মাত্র ১৮ জন ব্যক্তি এই ধর্মমত গ্রহণ করেছিল। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর সাথে সাথে দ্বীন-ই-ইলাহীরও অবসান ঘটে।

**আকবরের রাজপুতনীতি**

ভারত একটি বহুধা বিভক্ত দেশ। এতে নানা জাতি ও ধর্ম-বর্ণের মানুষ বসবাস করে। এই বিভক্ত জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে একটি একক ভারত সাম্রাজ্য গড়ে তোলার জন্য সম্রাট আকবর অনেকগুলো নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তার অন্যতম ছিল রাজপুতনীতি। সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করা ও ভারতের এই যোদ্ধা ও কূটনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য সম্রাট রাজপুতদের সহিত সহনশীল ও মিত্রতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই লক্ষ্যে ১৫৬২ খ্রি. আকবর আম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যা যোধাবাঈকে বিবাহ করেন। নিজ পুত্র সেলিমের বিবাহ তিনি ভগবান দাসের কন্যার সাথে সম্পন্ন করেন। সম্রাট সামরিক ও বেসামরিক উচ্চ রাজপদে রাজপুতদের নিয়োগ দেন। রাজা মান সিংহ, ভগবান দাস, রাজা বিহারীমল, বীরবল ও টোডরমল প্রমুখ সবাই ছিলেন উচ্চ রাজপদ অধিকারী ও মনসবদার। সম্রাট হিন্দুদের তীর্থকর ও জিজিয়া কর রহিত করেন। তিনি হিন্দু মেলা ও মন্দির প্রদর্শন করতেন। সম্রাটের এই রাজপুত নীতি পরবর্তী কয়েকশ বছর মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য অনেক কল্যাণ বয়ে এনেছিল। এটি ছিল মধ্যযুগীয় রাজনীতি ও শাসনতন্ত্রের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

| শিক্ষার্থীর কাজ | আকবরের দাক্ষিণাত্য নীতি লিখুন। |
|---|---|

## সারাংশ

সম্রাট আকবর শুধু ভারতের ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ শাসক নন, তিনি ছিলেন সমসামায়িক বিশ্বের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ ণৃপতি। মাত্র ১৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। উত্তরে কাশ্মীর হতে দক্ষিণে আহমেদনগর ও মধ্য এশিয়ার কাবুল কান্দাহার হতে পূর্ব বাংলা পর্যন্ত একচ্ছত্র মুঘল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি একক ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী চেয়েছিলেন। তাই তিনি ভারতের প্রাচীন, সমরকুশলী ও মেধাবী রাজপুত শক্তির সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং ধর্মীয়ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কার সাধন করেন। তাই ইতিহাসে তিনি 'আকবর দ্যা গ্রেট' নামে অভিহিত।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

### বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১। আকবর কত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন?
(ক) ১৪ (খ) ১২ (গ) ১৩ (ঘ) ১৫

২। আকবর আহমেদ নগরের যুদ্ধে কাকে পরাজিত করেন?
(ক) সুলতান রাজিয়া (খ) চাঁদ সুলতানা (গ) নূরজাহান (ঘ) সালিমা বেগম

৩। 'দ্বীন-ই-ইলাহী' কত সনে প্রবর্তিত হয়?
(ক) ১৫৮০ (খ) ১৫৮১ (গ) ১৫৮২ (ঘ) ১৫৮৩

৪। 'দ্বীন-ই-ইলাহী' এর কতজন সদস্য ছিলেন?
(ক) ১৩ (খ) ১৪ (গ) ১৫ (ঘ) ১৬

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্নঃ**

সম্রাট ফিরোজ মাহমুদ নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সব ধর্মের নির্যাস নিয়ে এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। তিনি তার সাম্রাজ্যে বহুবিধ রাজ্য বিজয় সম্পন্ন করেন এবং রাজপুতদের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

১. পানিপথের ২য় যুদ্ধ কতসালে সংঘটিত হয়? ১
২. দীন-ই-ইলাহী মতবাদ সম্পর্কে ধারণা দিন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের গৃহীত রাজপুতনীতির সাথে মুঘল বংশের যে শাসকের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা তুলে ধরুন। ৩
৪. পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত শাসকের দাক্ষিনাত্য বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৪

# পাঠ-৩.৬ সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থা, সংস্কারমূহ ও কৃতিত্ব

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- আকবরের শাসন প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আকবরের সংস্কার সম্পর্কে জানবেন ও
- আকবরের কৃতিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | **মনসবদারি ব্যবস্থা, মীর বকশী, কাজী-উল-কুজ্জাত, রাজা টোডরমল ও সুবাদার** |

**শাসনব্যবস্থা:**

মুঘল শাসকদের মধ্যে সম্রাট আকবরই সর্বপ্রথম সুসংহত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। রাজ্যবিস্তারের পাশাপাশি সাম্রাজ্যে শাসন সুদৃঢ়করণে মহামতি আকবর ছিলেন ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি উদারনীতি অনুসরণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ভারতীয়, পারসিক, তুর্কি ও সুলতানি আমলের শাসনব্যবস্থাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী দুই শাসক সম্রাট বাবর ও সম্রাট হুমায়ুন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকার সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়করণে কোন শাসন প্রণালী প্রবর্তন করতে পারেননি। কিন্তু সম্রাট আকবর শুরু থেকেই তার প্রতিভাবান শাসননীতি ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এর মাধ্যমে ভারতে দীর্ঘস্থায়ী মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরবর্তীকালে তার উত্তরাধিকারীগণ যথাযথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

**কেন্দ্রিয় শাসন ব্যবস্থা:**

শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন সম্রাট নিজে। সম্রাট নিজেই রাষ্ট্রের সর্বময়কর্তা ও সর্বপ্রধান ব্যবস্থাপক। আকবর সকল ধর্মীয় গোড়ামীমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। রাজকার্যে তিনি তার সভাসদ, মন্ত্রী ও উচ্চ রাজকর্মচারিদের মতামত গ্রহণ করতেন। কেন্দ্রিয় সরকারের অধীনে কতগুলো বিভাগের মাধ্যমে তিনি শাসনপ্রণালী কার্যকর করতেন।

**প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা:**

সুবিশাল ভারতকে শাসন করার জন্য আকবর তার সাম্রাজ্যকে ১৫৮২ খ্রি. ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং সুবার শাসক হিসেবে ১ (এক) জন সুবাদার নিয়োগ করেন।

সুবাগুলো হচ্ছে-

১) দিল্লি (২) আগ্রা (৩) আজমির (৪) বাংলা (৫) বিহার (৬) এলাহাবাদ (৭) অযোধ্যা (৮) মুলতান (৯) লাহোর (১০) কাবুল (১১) গুজরাট (১২) মালব (১৩) খান্দেশ (১৪) বেরার ও (১৫) আহমেদনগর।

সুবাদার ছাড়াও প্রদেশের এ শাসনকার্যে একজন দিওয়ান, আমিল, ফৌজদার, কাজি ইত্যাদি পদের রাজকর্মচারি ছিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেক সুবাকে কতগুলো সরকার ও প্রত্যেক সরকারকে কতগুলো পরগনায় বিভক্ত করেছিলেন।

**শাসন সংস্কার:**

**রাজস্ব সংস্কার**

রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য আকবর শের শাহের রাজস্ব নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মোজাফফর খান তুরবতী ও রাজা টোডরমল রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। টোডরমল 'ইলাহীগঞ্জ' নামক রাশের চেইন ব্যবহার করে আবাদ যোগ্য জমির সঠিক পরিমাণ করেন। তিনি জমিকে উৎপাদন সক্ষমতা অনুযায়ী পোলাজ, পারউতি, চাচর ও বন্জর এ চারভাগে বিভক্ত করেন। রাজস্ব হিসেবে ফসলের এক তৃতীয়াংশ রাষ্ট্র আদায় করত। এই ব্যবস্থা রায়তোয়ারি ব্যবস্থা বা

'যাবতি' পদ্ধতি নামেও পরিচিত। রাজস্বের উৎস হিসেবে ভূমি রাজস্ব ছাড়াও বাণিজ্য শুল্ক, টাকশাল, উপঢৌকন ইত্যাদি হতেও রাজস্ব আয় হত।

**বিচার ব্যবস্থা**

আকবর ন্যায়বিচারের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তাহের ১টি দিন তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। তার পরই ছিলেন কাজী উল কুজ্জাত, মুফতি ও মীর আদিল।

**সামরিক ব্যবস্থা**

সম্রাট আকবর পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌ-বাহিনী এই চার ভাগে তার সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করেন। মীর-ই-বকশি, মীর-ই-আতিশ এবং আমির-ই-বহর ছিলেন যথাক্রমে গোলন্দাজ পদাতিক বাহিনী বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর প্রধান। সম্রাট নিজে ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

ফতেহপুর সিক্রি

**মনসবদারি ব্যবস্থা**

'মনসব' শব্দের অর্থ পদ বা পদমর্যাদা। এই পদের অধিকারীকে মনসবদার বলা হত। সমগ্র সেনাবাহিনীকে সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করার জন্য সম্রাট এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের মনসবদাররা দশ হাজারি পদ থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে দশজন সৈন্য সংরক্ষণের বিধান ছিল। সাধারণত রাজপরিবারের সদস্য ও সম্ভ্রান্ত সভাসদগণ দশ হাজারি পদ পেতেন। আকবর ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। মনসবদারগণ জাত ও সওয়ার নামক ২টি পদমর্যাদা পেতেন। এদের মাসিক বেতন ৩২০০ টাকা হতে সর্বনিম্ন ১০০ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ ছিল।

**আকবরের কৃতিত্ব**

ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, সম্রাট আকবর শুধুমাত্র ভারতের ইতিহাসে নয় সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে ছিলেন একজন স্মরণীর শাসক। মুঘল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্রাট আকবর। বহুমুখী প্রতিভাধর ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের এই সম্রাটের তুলনা তৎকালীন বিশ্ব রাজনীতিতে ছিল বিরল। তিনি একাধারে ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও সংগঠক। শাসনসংস্কার ও সাম্রাজ্য পরিচালনায় তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ শাসক। আকবর শুধুমাত্র একজন সমরকুশলী ও সুশাসকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একই সাথে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক। বহু জ্ঞানী তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর রাজসভায় 'নবরত্ন' ছিলেন ইতিহাস বিখ্যাত গুণী তানসেন, বীরবল প্রমুখ। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজস্ব ব্যবস্থা, বিচার ও সামরিক বিভাগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি আমুল সংস্কার সাধন করেন। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে আধুনিক শাসনের রূপকার ও শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | **আকবরের কেন্দ্রিয় শাসন ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে লিখুন।** |

**সারাংশ**

সম্রাট বাবরের সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যকে সম্রাট আকবর এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। তিনি ছিলেন একাধারে সমরকুশলী, রাজনীতিবিদ ও সুদক্ষ রাষ্ট্র সংগঠক। তিনি ছিলেন সমসাময়িক বিশ্বের অগ্রগণ্য ণৃপতি এবং ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

**বহু নির্বাচনী প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১) আকবর তার সাম্রাজ্যকে কয়টি সুবায় বিভক্ত করেন?
(ক) ১১ (খ) ১২ (গ) ১৪ (ঘ) ১৫

২) রাজা টোডরমলের ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার নাম কি ছিল?
(ক) যাবতি ব্যবস্থা (খ) জমিদারী ব্যবস্থা (গ) কবুলিয়াত (ঘ) পাট্টা

৩) মুঘল বিচার ব্যবস্থার সর্বময় কর্তা কে ছিলেন?
(ক) কাজী-উল-কুজাত (খ) মুফতি (গ) সম্রাট (ঘ) উলেমাগন

৪) কত সালে মনসবদারি প্রথা চালু হয়?
(ক) ১৫৭৭ (খ) ১৫৭৮ (গ) ১৫৬০ (ঘ) ১৫৫৬

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্নঃ**

তারাশঙ্কর ছিলেন একজন প্রজাদরদী স্বৈরাচারী শাসক। ঐতিহাসিকগণ তাঁর শাসনব্যবস্থাকে 'Perso-Arabic System in India Setting' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি শুধু বিশাল সাম্রাজ্য রচনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না; তার সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য এক অতি উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালীর প্রবর্তন করে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ শাসন সংস্কারক হিসেবে অপরিসীম খ্যাতি অর্জন করেন।

১. মনসব শব্দের অর্থ কি? ১
২. মনসবদারী প্রথা সম্পর্কে লিখুন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের শাসন প্রনালীর সাথে আপনার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের মিল রয়েছে বর্ণনা করুন। ৩
৪. বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কারক হিসেবে পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৪

# পাঠ-৩.৭ সম্রাট জাহাঙ্গীর ঃ নূর-জাহানের প্রভাব, চরিত্র ও কৃতিত্ব

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- সম্রাট জাহাঙ্গীর সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের উপর নূরজাহানের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ও
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | **দস্তর-উল-আমল, খুররম ও নুর-জাহান** |

### সম্রাট জাহাঙ্গীর

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম ৩৬ বছর বয়সে ১৬০৫ খ্রি. ২৪ অক্টোবর নূর উদ্দীন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী উপাধি নিয়ে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত চরিত্র ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি প্রজা কল্যাণের দিকে মনোনিবেশ করেন। সম্রাট আকবর আদর করে তাঁকে শেখু বাবা বলে ডাকতেন।

**জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীঃ**

**দস্তর-উল-আমল**

সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি দস্তর-উল-আমল নামক ১২টি আইন প্রণয়ন করে ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

**নওরোজ পালন**

সম্রাট জাহাঙ্গীর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য ১৬০৬ খ্রি. মার্চ মাসে জাকজমকের সাথে নওরোজ উৎসব পালন করেন।

**শাহজাদা খুসরুর বিদ্রোহ ও শিখগুরু অর্জুনের হত্যা**

সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র খুসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রাজা মান সিং, খান-ই-আজম, আজিজ কোকা খুসরুকে সমর্থন দান করেন। খুসরু পাঞ্জাবে পলায়ন করলে সেনাপতি দিলওয়ার খান জলন্ধরের যুদ্ধে খুসরুকে পরাজিত ও বন্দী করেন। দশবছর কারারুদ্ধ থাকার পর অন্ধ খুসরু ১৬২২ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। শিখগুরু অর্জুন শাহজাদা খুসরুকে বিদ্রোহী অবস্থায় অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। সম্রাট তার নিকট অর্থের কৈফিয়ত তলব করলে অর্জুন উদ্ধত্ত প্রকাশ করেন। সম্রাট তাকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন।

**মেবার বিজয় (১৬১৫ খ্রি.)**

মেবারের রাজা বীর কেশরী রানা প্রতাপের পুত্র ছিলেন অমর সিংহ। সম্রাট জাহাঙ্গীর সম্রাট আকবরের নীতি অনুসরণ করে মেরার জয় করার সংকল্প করেন। শাহজাদা পারভেজ, আব্দুল্লাহ খান ও মহব্বত খান এর অভিযান ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৬১৫ খ্রি. শাহজাদা খুররম অমর সিংহকে পরাজিত করে মেবার জয় করেন।

**কাংড়া বা নাগরকেটি দুর্গ জয় (১৬২০ খ্রি.)**

পাঞ্জাবের শাসক মূর্তজা খান কাংড়া দুর্গ দখলে ব্যর্থ হলে শাহজাদা খুররম সুরক্ষিত দুর্গটি ১৬২০ খ্রি. অধিকার করেন।

**দাক্ষিণাত্য অভিযান**

আহমেদ নগরের মন্ত্রী মালিক আম্বর মুঘল প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি মারাঠাদেরকে তার সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেন। ১৬১৭ খ্রি. খুররম মালিক আম্বরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং আহমেদনগর দুর্গ ও বালাঘাট অঞ্চল অধিকার করেন। এই বিজয় গৌরবে সম্রাট খুররমকে শাহজাহান (পৃথিবীর রাজা) উপাধি প্রদান করেন।

**শাহজাহান ও মহব্বত খানের বিদ্রোহ**

১৬২৩ খ্রি. শাহজাহান সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন কিন্তু মহব্বত খান ও পারভেজের নিটক পরাজিত হন। সম্রাট তাকে ক্ষমা করেন। মূলত সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে মহব্বত খান বিদ্রোহ করেন এবং সম্রাটকে কাবুল যাওয়ার পথে বন্দি করেন। নূরজাহানের বুদ্ধিমত্তায় সম্রাট মুক্তি লাভ করেন এবং মহব্বত খান দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬২৭ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।

**নূরজাহানের প্রভাব**

নূরজাহানের প্রকৃত নাম মেহের-উন-নিসা। তিনি ছিলেন ইরানের ইস্পাহান হতে আগত ভাগ্য অন্বেষণকারী মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা। নুরজাহান ছিলেন অপূর্ব রূপসী ও বহুবিদ গুণের অধিকারী। যুবরাজ সেলিম নূরজাহান দ্বারা প্রভাবিত হলেন। কিন্তু সম্রাট আকবরের নির্দেশে পারসিক যুবক আলীকুলি খানের সাথে নূরজাহানের বিবাহ সম্পন্ন হয়। আলীকুলী খানকে বাংলার বর্ধমানে জায়গীর প্রদান করা হয়। কিন্তু ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক সামরিক অভিযানে মৃত্যুবরণ করেন। অতপর, ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট মেহের উন নিসাকে বিবাহ করেন এবং তার উপাধি দেন 'নূর মহল' (প্রাসাদের আলো) ও পরে নূরজাহান (পৃথিবীর আলো)। সম্রাটের রাজকার্যে নূরজাহানের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তার ভ্রাতা আসফ খান ও পিতা মীর্জা গিয়াস বেগ রাজদরবারে উচ্চ পদে আসীন হন। সম্রাট তার প্রিয় সম্রাজ্ঞীর নামে মুদ্রা জারি করেন। নূরজাহান তার প্রথম পক্ষের কন্যা লাভলী বেগমের সাথে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারের বিবাহ দেন। ১৬১২ খ্রি. আসফ খানের কন্যা আরজুমান্দ বানুর সাথে শাহজাদা খুররমের বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং আসফ খান তার নিজ জামাতার সিংহাসন লাভ করার প্রতি উচ্চাভিলাষী ছিলেন। এতে করে নূরজাহান এর জামাতা শাহরিয়ার এর সহিত খুররমের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে। অবশেষে সম্রাটের মৃত্যুর পর শাহজাদা খুররম শাহরিয়ারকে পরাজিত করে মুঘল সিংহাসন দখল করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সম্রাজ্ঞী রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করেন এবং লাহোরে তার একমাত্র কন্যা লাভলী বেগমকে নিয়ে বাকী জীবন অতিবআহত করেন। ১৬৪৫ খ্রি. নূরজাহান মৃত্যুবরণ করেন। নূরজাহান ছিলেন মুঘল যুগের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের রমনী। তার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তা, উচ্চাকাঙ্খা, নানাবিধ গুণের উপস্থিতি তাকে সম্রাটের নিকট অত্যন্ত প্রিয়ভাজন করে তুলেছিল। তাই সম্রাটের রাজনৈতিক জীবনে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সম্রাট নিজেই কাব্য করে বলতেন, "I have sold my kingdom to my beloved queen for a cup of wine and a dish of soup".

**জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্বঃ**

মুঘল সম্রাটের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। তিনি তাঁর রাজ্য পরিচালনায় সম্রাট আকবরের নীতি অনুসরণ করেন। তাঁর সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। তিনি সামরিক অভিযান পরিকল্পনা প্রস্তুত করতেন। তিনি প্রশাসনে ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে ইংরেজরা ভারতে বাণিজ্য করতে আসে। ১৬০৮ সালে ক্যাপ্টেন হকিংস রাজা প্রথম জেমসের অনুরোধ পত্র নিয়ে তাঁর দরবারে আসেন। ১৬১৫ সালে টমাস রো পুনরায় তার দরবারে আসেন। জাহাঙ্গীর শিল্প, সাহিত্য ও চিত্রকলার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তার সময়ে মুঘল চিত্রকলার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্রাটের সঙ্গীতের প্রতিও বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁর আত্মজীবনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী রচনা করেন।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | **নূরজাহানের প্রভাব মূল্যায়ন করুন।** |
|---|---|

**সারাংশ**

সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর পিতার দেখানো পথই অনুসরণ করেন। কিন্তু তাঁর রাজত্ব কালে পুত্রদের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। অবশেষে শাহজাদা খুররম উত্তরাধিকারী হিসেবে বিজয়ী হন। তিনি ছিলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

**বহু নির্বাচনী প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১) সম্রাট জাহাঙ্গীরের ডাক নাম কি ছিল?
(ক) মুরাদ (খ) পারভিজ (গ) শেখু বাবা (ঘ) খুররম

২) কতসালে জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন
(ক) ১৬০২ (খ) ১৬০৩ (গ) ১৬০৪ (ঘ) ১৬০৫

৩) নূরজাহান ও নুরমহল কার উপাধি ছিল?
(ক) মেহের উন নিসা (খ) আরজুমান্দবানু (গ) সালিমা বেগম (ঘ) যোধাবাঈ

৪) সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর নাম কি?
(ক) আইন-ই-আকবরী (খ) আকবর নামা (গ) তুজুকই জাহাঙ্গীরী (ঘ) বাদশা নামা

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্নঃ**

আনিকা তার ভাইয়ের কাছ থেকে ভারতবর্ষের মুঘল সাম্রাজ্যের এমন একজন শাসক সম্পর্কে অবগত হল, যার চরিত্রের মধ্যে বিপরীত গুণাবলির সংমিশ্রন ছিল। তাঁর সিংহাসনের পশ্চাৎ শক্তি হিসেবে একজন মহীয়সী নারীর বিপুল প্রভাব ছিল। ইউরোপীয়দের সাথেও তাঁর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এছাড়াও তিনি তার সাম্রাজ্যে বেশ কিছু সংস্কার সাধন করেছিলেন।

১. নূরজাহানের প্রকৃত নাম কি ছিল? ১
২. দস্তর-উল আমল সম্পর্কে লিখুন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সিংহাসনের পশ্চাতে এক মহীয়সী নারীর প্রভাব ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৩
৪. "উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের চরিত্রের মধ্যে বিপরীত গুণাবলির সংমিশ্রন ছিল"–পাঠ্যবইয়ের আলোকে তুলে ধরুন। ৪

# পাঠ-৩.৮ সম্রাট শাহজাহান

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- সম্রাট শাহজাহান ও তার স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন ও
- শাহজাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | **তাজমহল, দারাশিকোহ, ময়ূরসিংহাসন ও মমতাজ মহল** |

## সম্রাট শাহজাহান

### প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসন আরোহণ

সম্রাট জাহাঙ্গীরের চার পুত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শাহজাহান। শাহজাহানের প্রকৃত নাম ছিল খুররম। তিনি জাহাঙ্গীরের রাজপুত পত্নী জগৎ গোসাইয়ের পুত্র। আকবর ও জাহাঙ্গীরের প্রিয়পাত্র খুররম শৈশব থেকেই ছিলেন শিক্ষা ও সমরবিদ্যায় কুশলী। তিনি যুবরাজ থাকা অবস্থায় অনেক অভিযান পরিচালনা করেন ও বিজয়ী হন। আহমেদ নগর অভিযানে মালিক আম্বরকে পরাজিত করে তিনি তার পিতার নিকট হতে শাহজাহান উপাধি লাভ করেন। ১৬২২ সালে শাহজাহান আসফ খানের কন্যা আরজুমান্দ বানু বেগমকে বিবাহ করেন। পিতার বিরুদ্ধে শাহজাহান বিদ্রোহ করলেও তিনিই ছিলেন জাহাঙ্গীর এর সবচেয়ে যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাই সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান ১৬২৮ খ্রি. ১৪ ফেব্রুয়ারি গাজী উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। আসফ খানকে শাহাজাহান প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেন।

### শাহজাহানের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ:

#### খানজাহান লোদীর বিদ্রোহ

আফগান সর্দার খানজাহান লোদী আহমেদ নগরের নিজামুল মুলক এর সমর্থনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শাহজাহানের সেনাপতি আব্দুল্লাহ ও মোজাফফর ১৬৩১ খ্রি. দীর্ঘ ৩ বছর অভিযানের পর কালিঞ্জরের তালসিহোন্দ নামক স্থানে খানজাহান লোদীকে পরাজিত করেন।

#### পর্তুগীজদের দমন

সাতগাঁও ও হুগলিতে পর্তুগীর্জদের বাণিজ্যকুঠি ছিল। তাঁদের নানা অপকর্ম এদেশে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিসাধন করছিল। সম্রাট নিজেও পর্তুগীজদের উদ্ধত আচরণে ক্ষুব্ধ ছিলেন। বিশেষত মমতাজ মহলের দুইজন দাসীকে অপহরণ করে ও সম্রাট হওয়ার পর শাহজাহানকে উপঢৌকন না পাঠিয়ে পর্তুগীজরা সম্রাটের বিরাগভাজন হন। ১৬৩২ সালে কাসিম খান এর পুত্র এনায়েতউল্লাহ পর্তুগীজদের উপর আক্রমণ চালায়। পর্তুগীজরা তখন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়।

#### শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে কান্দাহার হস্তচ্যুত হলে শাহজাহান এর প্রচেষ্টায় ১৬৩৮ খ্রি. কান্দাহার পুনরায় মুঘল অধিকারে আসে। কিন্তু ১৬৪৮ খ্রি. পারস্য শাসক শাহ আববাস কান্দাহার জয় করে নেন। শাহজাহান প্রথমে দৌলত খান ও পরে ১৬৪৯ খ্রি. শাহজাদা আওরঙ্গজেব ও প্রধানমন্ত্রী সাদ উল্লাহ খানের নেতৃত্বে অভিযান পাঠান। তবে ১৬৫২ সালে পারস্যের উন্নত রণকৌশল ও সামরিক দক্ষতার কাছে মুঘল বাহিনী পরাজিত হয়। তাই এই অভিযান ব্যর্থ হয়।

**মধ্য এশিয়ানীতি**

মধ্য এশিয়ায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষে শাহজাহান তাঁর পুত্র মুরাদ ও সেনাপতি আলী মর্দানকে প্রেরণ করেন। মুঘলবাহিনী বলখ ও বাদাখশান জয় করে। কিন্তু বৈরী আবহাওয়ায় অভিযান অগ্রসর হয়নি। ১৬৪৭ খ্রি. শাহজাদা সুজা ও আওরঙ্গজেব অপর অভিযান পরিচালনা করে। তবে এই অভিযানও ব্যর্থ হয়।

**দাক্ষিণাত্য নীতি**

সম্রাট আকবরের সময়ে দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ ও বেরার মুঘল অধিকারে এসেছিল। আহমেদ নগরের বিশৃংখলার সুযোগ নিয়ে বিজাপুর ও গোলকুন্ডা মুঘল হস্তচ্যুত হয়। সম্রাট শাহজাহান এর শক্তিশালী কূটনীতিক নীতির ফলে ১৬৩৩ খ্রি. আহমেদনগর মুঘল অধিকারে আসে। শিয়া রাজ্য দুটি বিজাপুর ও গোলকুন্ডা ১৬৩০-১৬৩৬ খ্রি. মধ্যে মুঘল অধিকার আসে। দাক্ষিণাত্য হস্তগত করে সম্রাট তার তৃতীয়পুত্র শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে সেখানকার সুবাদার নিয়োগ করেন। আওরঙ্গজেব ১৬৪৫ খ্রি. একবার পদচ্যুত হয়ে গুজরাটের সুবাদারি লাভ করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে সম্রাট তাকে ১৬৫৩ খ্রি. পুনরায় দাক্ষিণাত্যের সুবাদারি অর্পণ করেন।

**স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ**

মুঘল ইতিহাসে শাহজাহানের রাজত্বকাল "The Age of Marble" নামে খ্যাত। সম্রাট শাহজাহান ছিলেন শিল্পকলা, স্থাপত্য ও সৌন্দর্যের পূজারী। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা। তিনি ইতিহাসে "The Prince of Builders or Engineer King" নামে পরিচিত। তার স্থাপত্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তিনি লাল পাথরে স্থলে মূল্যবান শ্বেত মর্মম পাথর (White marbel) ব্যবহার করেছেন। তার রাজত্বকালে দিল্লি, আগ্রা, লাহোরে ব্যাপক স্থাপত্য শৈলী তৈরী করা হয়েছিল। কাবুল, কান্দাহার ও কাশ্মিরে মনোরম উদ্যান, প্রাসাদ, মসজিদ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল। রাজধানী আগ্রাতে তিনি নির্মাণ করেছিলেন দীউয়ান-ই-আম, দীউয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, সালিমার উদ্যান, শীষ মহল ইত্যাদি। শাহজাহান ১৬৩৮ খ্রি. রাজধানী আগ্রা হতে দিল্লিতে স্থানান্তর করেন এবং নতুন নগরীর নাম দেন শাহজাহানাবাদ। এখানে তিনি লালকেল্লা, মমতাজ মহল ইত্যাদি নির্মাণ করেন। তার মসজিদ স্থাপত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল দিল্লির জামে মসজিদ। এছাড়াও তিনি বহু মূল্যবান রত্ন খচিত জগৎবিখ্যাত ময়ুর সিংহাসন তৈরি করেন।

**তাজমহল**

সম্রাট শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল আগ্রার তাজমহল। যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত তাজমহল হচ্ছে সম্রাট তার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিকে অমর করে রাখার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। বিশ হাজার দক্ষ শিল্পী ও কারিগর সুদীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ এই সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। সম্রাট নিজেই ছিলেন এর পরিকল্পনাকারী। প্রধান স্থাপতি ছিলেন ইসফানদিয়ার রুমী ও মাস্টার ঈসা। ভারতীয় ও পারসিক শিল্পকলার মিলন ঘটিয়ে তাজমহল নির্মিত হয়েছে। এটি যুগ যুগ ধরে স্থাপত্য বিদ্যার উৎকর্ষ ও মুঘল শাসনের স্বর্ণযুগের নিদর্শন হিসেবে টিকে আছে।

**শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ**

সম্রাট শাহজাহান ১৬০৭ সালের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পিতার রোগ শয্যায় তাঁর চারপুত্র সিংহাসনের অধিকার নিয়ে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। সম্রাটের চার পুত্র ছিলেন বয়সের ক্রমানুসারে দারা শিকো, শাহ সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। আর দুই কন্যা ছিলেন জাহনারা ও রওশন আরা। পুত্রগণ সামরিক দিক থেকে সকলে সমান দক্ষ ছিলেন না। এদের মধ্যে:

- জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ ছিলেন ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার। তিনি ছিলেন পাঞ্জাব ও দিল্লির শাসনকর্তা। তিনি পন্ডিত হলেও আচার আচরণে উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন।
- শাহাসুজা ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। তিনি সুদক্ষ যোদ্ধা, সাহসী, রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন হলেও তিনি ছিলেন আয়েশী প্রকৃতির।
- শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব ছিলেন সর্বাপেক্ষা দক্ষযোদ্ধা, প্রশাসন ও কূটনৈতিক জ্ঞানের অধিকারী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একজন মুসলিম।

- কণিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের সুবাদার। তবে তিনি ছিলেন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও প্রশাসন জ্ঞানে অদূরদর্শি। সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার যুদ্ধের পিছনে কতগুলো সুনির্দিষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হল:
- সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব-
- ব্যক্তিগত চরিত্রের পার্থক্য-
- পুত্রদের প্রতি সম্রাটের পক্ষপাতমূলক আচরণ
- রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ
- মসনদের মোহ

দারাশিকোহ পিতার রোগশয্যার সুযোগ নিয়ে রাজ্যের শাসন তার হাতে তুলে নেন। তিনি পিতার রোগের সংবাদ তার ভাইদের নিকট গোপন রাখেন এবং গুজরাট, দাক্ষিণাত্য ও বাংলার সাথে সকল যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। দারার এমন কপটচারী আচরণ তার অন্যান্য ভাইদের আহত করে। গৃহযুদ্ধ তখন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে।

**বাহাদুরগড়ের যুদ্ধ**

দারার অপর তিন ভাই নিজ নিজ অঞ্চলে নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা জারী করেন। আওরঙ্গজেব বোন রওশন আরার কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য গ্রহণ করে শাহ সুজার সাথে দারার বিরুদ্ধে চুক্তি করেন এবং মুরাদকে নিজের দলভুক্ত করে নেন। শাহসুজা বাংলা হতে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন। শাহজাহান দারার পুত্র সুলায়মান শিকোকে প্রেরণ করেন। সুলায়মান ১৬৫৮ খ্রি. ২৪ জানুয়ারি বারানসীর নিকট বাহাদুরগড়ের যুদ্ধে শাহ সুজাকে পরাজিত করেন।

**ধর্মাটের যুদ্ধ**

মুরাদ আওরঙ্গজেবের যৌথ সেনাবাহিনী দিল্লির নিকটবর্তী ধর্মাট নামকস্থানে উপস্থিত হয়। যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খানের মিলিত বাহিনী ১৬৫৮ খ্রি. ১০ এপ্রিল প্রচন্ড লড়াই করে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের যৌথ বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়।

**সামুগড়ের যুদ্ধ**

ধর্মাটের যুদ্ধের পরাজয় যুবরাজ দারা শিকোকে ক্ষুব্ধ করে। ১৬৫৮ খ্রি. প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি আগ্রার নিকটবর্তী গোয়ালিয়ারের সামুগড়ে এসে পৌছান। বহু রাজপুত যোদ্ধা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু দারার ব্যর্থ রণকৌশলে মুঘলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং মুরাদ ও আওরঙ্গজেব এর যৌথবাহিনী তাদের বিজয় নিশ্চিত করে।

**গৃহযুদ্ধের শেষ অঙ্ক**

গৃহযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে আওরঙ্গজেব আগ্রায় সিংহাসন দখল করেন। তিনি তার পিতা শাহজাহানকে আগ্রাদুর্গে বন্দি করে রাখেন। শাহজাদা মুরাদকে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে গুজরাটের দিওয়ান আলী নকীকে হত্যার দায়ে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন। শাহ সুজাকে দমন করার জন্য আওরঙ্গজেব মীর জুমলাকে প্রেরণ করেন। শাহসুজা আরাকানে পালিয়ে যান। দারাশিকোহ প্রথমে লাহোর পরে মুলতান ও শেষে গুজরাটে আশ্রয় নেন। আজমিরে যশোবন্ত সিংহের ষড়যন্ত্রে তিনি দেওয়ারের যুদ্ধে আরঙ্গজেবের নিকট চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন।

**শাহজাহানের চরিত্র ও কৃতিত্ব**

শাহজাহানের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। তবে তিনি যে কোনো বিচারে শিক্ষিত, মার্জিত রুচিবোধ ও বিদ্যাৎসাহী ছিলেন। আভিজাত্যের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তিনি সামরিক দিক থেকে মোটামুটি সফল ছিলেন। তবে তাঁর উত্তর পশ্চিম সীমান্তনীতি ও মধ্য এশিয়ায় তেমন সাফল্য পাননি। কিন্তু তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতি সফল হয়। তাঁর সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য অনেকদূর বিস্তার লাভ করে। তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সম্রাট আকবরকেই অনুসরণ করেন। তাঁর রাষ্ট্রশাসনে প্রতিভার সমাবেশ লক্ষ্যনীয়। তাঁর সময়ে ভারত এশিয়া ও ইউরোপের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কের সূচনা হয়। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতিপ্রেমী ছিলেন। আব্দুল হামিদ খান লাহোরী, মির্জা জিয়াউদ্দিন, আব্দুল হাকিম শিয়ালকোটী, মুহিব আলী সৈয়দী, তুলসীদাস তার পৃষ্ঠপোষকতা পান। তবে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তার স্থাপত্য শিল্পে। ঐতিহাসিকগণ তার রাজত্বকালকে 'The Age of Marbel'

বা 'The Golden Age of the Mughals' বলে অভিহিত করেন। এই মহান মুঘল সম্রাট এর শেষ জীবন অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ছিল। পুত্র আওরঙ্গজেব কর্তৃক দীর্ঘ আট বছর আগ্রা দুর্গে অন্তরীণ থেকে ১৬৬৬ খ্রি. ২২ জানুয়ারি ৭৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | **সম্রাট শাহজাহানের তাজমহল যুগের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-এর স্বপক্ষে লিখুন।** |
|---|---|

**সারাংশ**

শাহজাহানের রাজত্বকাল মুঘল ইতিহাসের স্বর্ণময় এক অধ্যায়। তিনি ছিলেন তার পূর্ববর্তী শাসকদের মতই সামরিক প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনায় দক্ষ এক ণৃপতি। তার সময়কাল মুঘল ইতিহাসের চিত্রকলা ও স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ বলে বিবেচিত ও প্রশংসিত। তবে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে তার পুত্রদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধের সূচনা ও তিন পুত্রের মৃত্যু তার শাসনকে কিছুটা কলঙ্কিত করেছে। তবে মুঘল ইতিহাসে তিনি প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতিতে তাজমহলের স্রষ্টা ও 'Prince of builders' নামে আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮

### বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১) শাহজাহানের মাতার নাম কি?
(ক) মনিবাই (খ) যোধাবাই (গ) জগৎ গোসাই (ঘ) নূরজাহান

২) কতসালে শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন-
(ক) ১৬২৭ (খ) ১৬২৮ (গ) ১৬২৯ (ঘ) ১৬৩০

৩) শাহজাহান কোন ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান চালান-
(ক) পর্তুগীজ (খ) দিনেমার (গ) ফরাসী (ঘ) ইংরেজী

৪) শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে বাংলার শাসক কে ছিলেন?
(ক) দারাশিকোহ (খ) শাহসুজা (গ) আওরঙ্গজের (ঘ) মুরাদ

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্নঃ**

শাহ আলম চৌধুরী খুবই রুচিবান ও সৌখিন রাজা ছিলেন। তার স্ত্রী রীনা চৌধুরী অনিন্দ্য সুন্দরী ও বিদূষী রমনী ছিলেন। শাহ আলম চৌধুরীর স্ত্রীর প্রতি ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী অকালে মৃত্যুবরণ করলে তিনি তার স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার্থে বহু অর্থ ব্যয়ে যে সৌধটি নির্মাণ করেন তা আজও বিদ্যমান রয়েছে। শাহ আলম চৌধুরীর পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব প্রবল হলে তিনি তা দমনে ব্যর্থ হন।

১. তাজমহলের স্থপতি কে ছিলেন? ১
২. সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সংঘটিত উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা করুন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের স্থাপত্যকর্মের সাথে সম্রাট শাহজাহানের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে তুলে ধরুন। ৩
৪. সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালকে কেন মুঘল ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে? যুক্তি দিন। ৪

# পাঠ-৩.৯ সম্রাট আওরঙ্গজেব ঃ দাক্ষিণাত্য নীতি, ধর্মনীতি, শাসন পদ্ধতি, চরিত্র ও কৃতিত্ব

## উদ্দেশ্য

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- আওরঙ্গজেব ও তার দাক্ষিণাত্য নীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- আওরঙ্গজেব এর ধর্মনীতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- আওরঙ্গজেব এর শাসন পদ্ধতি ও তার চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | **জিজিয়া, ফতোয়া-ই-আলমগিরি, শিবাজী, রাজসিংহ, মীর-জুমলা ও অহমরাজ্য** |

### সম্রাট আওরঙ্গজেব

মুঘল রাজবংশের শেষ শক্তিধর শাসক ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। তিনি ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র। তার প্রকৃত নাম ছিল মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আলমগীর। তিনি দাক্ষিণাত্যের ধুদে নামক স্থানে ১৬১৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি আরবি, ফার্সি, তুর্কিসহ বেশ কয়েকটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। সামরিক দিক থেকেও তিনি পারদর্শিতার পরিচয় দেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের দায়িত্ব লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ১৬৪৫ খ্রি. গুজরাট, ১৬৪৮ থেকে ১৬৫২ খ্রি. পর্যন্ত সিন্ধু ও মুলতানের শাসনকর্তার পদে নিয়োজিত ছিলেন।

### সিংহাসনে আরোহণ

শাহজাহানের চারপুত্রের মধ্যকার গৃহযুদ্ধে আওরঙ্গজেব বিজয়ী হন। তিনি বৃদ্ধপিতা শাহজাহানকে আগ্রার দুর্গে বন্দি করে ১৬৫৮ খ্রি. সিংহাসন অধিকার করেন। আওরঙ্গজেব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ভাই শাহ সুজা ও দারাশিকোকে পরাজিত করে ১৬৫৯ খ্রি. রাজ্য অভিষেক ঘটান এবং আবুল মুজাফ্ফর মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহ গাজী উপাধি গ্রহণ করেন।

### প্রাথমিক কার্যাবলী

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান ছিলেন। তিনি মুঘল রাজ দরবারের ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করেন। সম্রাটের ঝরোকা দর্শন, নওরোজ উৎসব, সংগীত ও তাজিয়া মিছিল নিষিদ্ধ করেন। মসজিদ ও খানকাহ সংস্কার, নির্মাণ এবং ইমাম ও সুন্নি ধর্মবেত্তাদের বেতন ভাতা বাড়িয়ে দেন। প্রজাদের প্রায় ৪০ প্রকার কষ্টসাধ্য কর বাতিল করেন। মুদ্রায় কলেমা অঙ্কন ও চন্দ্রমাসের বর্ষপঞ্জিও চালু করেন।

### সাম্রাজ্যবিস্তারঃ

### উত্তর-পূর্ব সীমান্তনীতি

উত্তর-পূর্ব সীমান্তনীতির অংশ হিসেবে আওরঙ্গজেব আসামে অভিযান প্রেরণ করেন। আসাম তখন অহমী হিন্দু জন জাতি কর্তৃক শাসিত ছিল। ১৬৫৮ খ্রি. উত্তররাধিকার সংগ্রামের সময় আসাম সম্রাট শাহজাহানের সময়কার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে। আওরঙ্গজেব তার সেনাপতি মীর জুমলাকে বাংলার সুবাদারি অর্পণ করেন। মীর জুমলা ১৬৬১ খ্রি. আসামে অভিযান পরিচালনা করেন। ১৬৬২ সালে কুচবিহার মুঘল অধিকারে আসে এবং এক নৌযুদ্ধে আসাম রাজ পরাজিত হন এবং ১৬৬৩ খ্রি. আসাম রাজা পুনরায় মুঘলদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

### সুবাদার শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খান ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব এর মাতুল আসফ খানের পুত্র। মীর জুমলার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব শায়েস্তাখানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। আসামের রাজা জয়ধবজের মৃত্যুর পর আসাম ও কামরূপ রাজা চক্রধবজের দখলে আসে। শায়েস্তা খান কামরূপও আসামে মুঘল আধিপত্য স্থাপনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কুচবিহার

মুঘলদের পদানত হয়। ঠিক একই-সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলায় পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচার বেড়ে যায়। শায়েস্তা খান এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন এবং সন্দ্বীপ দখল করেন। ১৬৬৬ সুবাদার শায়েস্তা খান এর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান চট্টগ্রামকে আরাকানী জলদস্যু হতে মুক্ত করেন এবং নাম রাখেন ইসলামাবাদ।

**উত্তর-পশ্চিম সীমান্তনীতি**

সম্রাট আওরঙ্গজেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বসবাসকারী ইউসুফ জাই, আফ্রিদি, খটক ইত্যাদি আফগান উপজাতিদের দমন করার জন্য বদ্ধ পরিকর হন। ১৬৬৭ খ্রি. ইউসুফ জাই গোত্র মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের দলপতি ভাগু মোল্লার অধীনে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনাপতি শমসির খান, আমিন খান ও আটোকের ফৌজদার কালিম খান এই বিদ্রোহ সফলভাবে দমন করেন। ১৬৭২ খ্রি. আফ্রিদি উপজাতি তাদের দলনেতা আকমল খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। আটোক থেকে কান্দাহার পর্যন্ত আফগান বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৭৪ খ্রি. তার সেনাপতি আকবর খান, শাহজাদা আকবর ও উজির আসাদ খানকে নিয়ে পেশোয়ার এ উপস্থিত হন। সম্রাট বিদ্রোহ দমনে কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এতে আফগান ঐক্যের মাঝে ফাটল ধরে। ১৬৭৫ খ্রি. সীমান্তের বিদ্রোহ প্রশমিত হলে সম্রাট রাজধানীতে ফিরে আসেন।

**রাজপুত-নীতি**

সম্রাট আকবর ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুসৃত রাজপুত নীতি সম্রাট আওরঙ্গজেব অনুসরণ করতে পারেনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার রাজপুত নীতি ব্যর্থ হয়েছিল।

**মারওয়ার অধিকার**

১৬৭৮ খ্রি. যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর মারওয়ার রাজ্যে উত্তরাধিকার সংকট দেখা দেয়। তবে এক রাণীর গর্ভে শিশুপুত্র জন্মলাভ করলে তার নামকরণ হয় অজিত সিংহ। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে রাজদরবারে রেখে প্রতিপালন করতে চাইলে রাজপুতরা এতে অপমানিত বোধ করেন এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সম্রাট যশোবন্ত সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রসিংহকে শাসক নিয়োগ করেন কিন্তু তিনি রাজপুতদের দমন করতে ব্যর্থ হওয়ায় সম্রাট তাকে পদচ্যুত করেন। এরপর সম্রাট শাহজাদা আকবর ও আজমিরের ফৌজদার এর নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। ১৬৭৯ খ্রি. অবশেষে যোধপুর ও মারওয়ার মুঘল অধিকারে আসে।

**মেবার বিজয় ও উদয়পুর চুক্তি**

মারওয়ারের রাজপুত্র অজিত সিংহের মাতা ছিলেন মেবারের রাজকন্যা। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে মেবারের রাজা উদয় সিংহ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই সময় জিজিয়া করকে কেন্দ্র করে রাজপুত ও সম্রাটের মধ্যকার দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। অপর রাজপুত রাজা জয়সিংহ ও দুর্গাদাস রানা রাজসিংহের সাথে চুক্তি করেন। সম্রাট এতে ক্ষুব্ধ হন এবং মেবার বিজয়ে অগ্রসর হন। রাজপুত শক্তি পরাজিত হয় এবং রানা রাজসিংহ পলায়ন করেন। মেবারের শাসনভার যুবরাজ আকবরের উপর অর্পণ করা হয়। রানা রাজসিংহ মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারী হন তার পুত্র জয়সিংহ। ক্রমাগত মুঘল ও রাজপুত শক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্ব সংঘাতে উভয় পক্ষই শান্তির পথ অনুসন্ধান করেন। ১৬৮১ খ্রি. উভয় পক্ষের সম্মতিতে ১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার শর্তানুসারে জয়সিংহকে মেবারের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

**দাক্ষিণাত্য-নীতি**

সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজপুতনার সাথে শান্তি স্থাপন করে এবার দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর দেন। তার দাক্ষিণাত্যনীতির সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে ছিল মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ।

**দাক্ষিণাত্যনীতির প্রেক্ষাপট**

প্রথমত; দাক্ষিণাত্যনীতি ছিল মুঘলদের সাম্রাজ্য বিস্তারের অংশ। উত্তর ভারতের আধিপত্য বজায় রেখে দক্ষিণ ভারতেও মুঘল শক্তি সম্প্রসারণের ইচ্ছাই ছিল আওরঙ্গজেব এর দাক্ষিণাত্যনীতির প্রধান উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত; বিজাপুর, গোলকুন্ডা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিয়া মুসলিম রাজ্যগুলো মুঘল অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সুতরাং সাম্রাজ্যে সম্রাট এ অবস্থা চলতে দিতে পারেন না।

তৃতীয়ত; বিজাপুর, গোলকুন্ডা নিয়মিত বার্ষিক কর প্রদানের অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল।

চতুর্থত; মারাঠারা এই সময় তাদের দলনেতা শিবাজীর নেতৃত্বে স্বাধীন মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি তৎপর হয়। যা ছিল মুঘল সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ। আওরঙ্গজেবের সাথে মারাঠাদের সংঘর্ষের বিবরণ নিম্নরূপ:

**ক) প্রথম পর্যায়**

ভারতে মারাঠাশক্তির অগ্রদূত ও মহানায়ক ছিলেন শিবাজী। শিবাজী ছিলেন শাহজী ভোসলে ও জিজাবাই এর পুত্র। তিনি ১৬২৭ খ্রি. কর্ণাটে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির মহানায়কদের বীরত্বগাথা শুনে শিবাজী স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেরণা পান। যৌবনে তিনি মারাঠা শক্তিকে নেতৃত্ব দিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ জাতিতে রূপান্তরিত করেন। মূলত ১৬৪৬ খ্রি. হতে ১৬৭৪ খ্রি. পর্যন্ত মুঘলদের সাথে শিবাজী এক দীর্ঘ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। আওরঙ্গজেব এর প্রধানমন্ত্রী আফজাল খানকে শিবাজী হত্যা করলে সম্রাট শায়েস্তা খান ও শাহজাদা মুয়াজ্জেমকে দাক্ষিণাত্যে সুবাদার করে পাঠান। শাহজাদা মুয়াজ্জেম কিছুটা সফল হন। তিনি ২৫টি দুর্গ দখল করতে সমর্থ হন। শিবাজী মুঘলদের সাথে পুরন্দরের চুক্তি সম্পন্ন করে। ১৬৭৪ খ্রি. শিবাজী ছত্রপতি উপাধি লাভ করে এবং এক হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৬৮০ খ্রি. শিবাজী মৃত্যুবরণ করে।

**খ) দ্বিতীয় পর্যায়**

১৬৮০-৮৭ খ্রি. পর্যন্ত সময়কালে, শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা শক্তি শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুন্ডা মুঘলদের করদ রাজ্য ছিল। তারা চুক্তি অস্বীকার করলে সম্রাট ১৬৬৫, ১৬৮০ ও ১৬৮২ সালে পরপর জয়সিংহ, দিলির খান ও শাহজাদা মোয়াজ্জেম কে দিয়ে ৩টি অভিযান প্রেরণ করেন। অবশেষে ১৬৮৬ সালে বিজাপুর মুঘল অধিকারে আসে। সম্রাট ১৬৮৫ খ্রি. গোলকুন্ডার সুলতান কুতুবশাহের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ৮ মাস দুর্গ অবরোধের পর গোলকুন্ডার প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ পনি উৎকোচ গ্রহণ করে দুর্গের ফটক খুলে দেন। গোলকুন্ডা অবশেষে মুঘলদের হস্তগত হয়।

**গ) তৃতীয় পর্যায়**

এই পর্যায়ে সম্রাট ১৬৮৭-১৭০৭ পর্যন্ত মারাঠা নেতা শম্ভুজী ও অন্যান্য মারাঠা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এক কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত সম্রাট মারাঠাদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। শম্ভুজীর পর মারাঠা নেতৃত্ব দেন শাহুজী, শিবাজীর অপর পুত্র রাজারাম, তার বিধবা স্ত্রী তারাবাঈ ও পুত্র তৃতীয় শিবাজী। সম্রাটের দাক্ষিণাত্যনীতি ছিল মুঘলদের জন্য অশনি-সংকেত ও সার্বভৌমত্বের এক বড় চ্যালেঞ্জ।

**আওরঙ্গজেব এর ধর্মনীতি**

নিষ্ঠাবান সুন্নী ধর্মাবলম্বী সম্রাট আওরঙ্গজেব এর ধর্মনীতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। জিন্দাপীর বা দরবেশ বাদশাহ উপাধিপ্রাপ্ত সম্রাটকে অনেক হিন্দু ঐতিহাসিক ধর্মান্ধ ও হিন্দুবিদ্বেষী বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিশেষ করে যদুনাথ সরকার, এস আর শর্মা, এ, এল শ্রীবাস্তব ও লেনপুল প্রমুখ সম্রাট আওরঙ্গজেব কে ধর্মান্ধ বলেছেন। তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে কতিপয় বর্ণবাদী অভিযোগ এনেছেন যেমন হিন্দু মন্দির ধ্বংস, জিজিয়া কর চালু, রাজ দরবারে হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা কমানো ইত্যাদি। তবে এই অভিযোগগুলো ছিল ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত। তিনি যেসব হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছেন তা ছিল বিদ্রোহীদের অস্ত্র ভান্ডার। এটি ছিল তার রাজনৈতিক পদক্ষেপ কোন ধর্মবিদ্বেষী উদ্দেশ্য নয়। ১৬৭৯ খ্রি. অমুসলিম নাগরিকদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য সম্রাট জিজিয়া কর চালু করেন। এটি ছিল তাঁর অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের পদক্ষেপ। এছাড়াও সম্রাটের রাজদরবারের মদ্যপান, সংগীত, নৃত্যকলা প্রদর্শন, ঝরোকা দর্শন, ব্যয় বহুল নওরোজ উৎসব ও বিলাসীতাকে ইসলামের পরিপন্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। এটি ছিল তাঁর ধর্মনিষ্ঠার উদাহরণ কোন রাজনৈতিক বা ধর্মবিদ্বেষী মনোভাব থেকে সম্রাট এটি করেননি। সম্রাট আওরাঙ্গজেব রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে ইসলামী শাসনপদ্ধতি অনুসরণ করতেন।

**চরিত্র ও কৃতিত্ব:**

সহজ সরল জীবনযাপনকারী আওরঙ্গজেব ছিলেন উদ্যমী, বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী। কোনরূপ ভোগবিলাস তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি কুরআনে হাফিজ ছিলেন এবং নিজ হস্তে কুরআন নকল করতেন ও টুপি সেলাই করতেন। ইসলামধর্মে তার প্রগাঢ় পান্ডিত্য ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ মুঘল শাসক। তিনি ছিলেন সুদক্ষ প্রশাসনিক জ্ঞানসম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান শাসক। আওরঙ্গজেব এর মত সুদক্ষ যোদ্ধা ও সমরকুশলী ণৃপতি মুঘল বংশে ছিল এক উজ্জল

নক্ষত্রের মত। ঐতিহাসিকরা বলেন, "লেখনী ও তরবারি তার হাতে সমান দক্ষতায় শোভা পেত"। তাঁর সময়ে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য ২১ টি সুবায় বিভক্ত ছিল। সম্রাট ছিলেন শিক্ষা ও জ্ঞানের একজন পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজেও আরবি ফার্সি ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। তাঁর সময়ে 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি' নামক আইন সংকলন রচিত হয়। এছাড়াও 'মাসীর-ই-আলমগিরি' বা আলমগিরনামা, 'মুনতা খাব আল জাবুর' তাঁর সময়ে রচিত হয়। সম্রাট একজন সুদক্ষ আরবি লিপিকার ছিলেন। এই মহান শাসক ১৭০৭ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | **সম্রাট আওরঙ্গজেবর এর ধর্মনীতি লিখুন।** |
|---|---|

**সারাংশ**

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর শাসনামল ছিল বিদ্রোহ বিশৃংখল ও সংগ্রামমুখর। তিনি অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সচেষ্ট হন। তাঁর রাজপুতনীতি, ধর্মীয়নীতি ও দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘসংগ্রাম শাসনামলের উল্লেখযোগ্য দিক। এছাড়া তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগান বিদ্রোহীদের দমন ও দক্ষিণ ভারতের শিয়া রাজ্যগুলোকে করদ রাজ্যে রূপান্তর ও রাজপুত শক্তিকে কঠোরভাবে দমন করে সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করেন। সফলতা ও ব্যর্থতা মিলিয়ে আওরঙ্গজেব ছিলেন সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ মুঘল শাসক। তারপর ধীরে ধীরে মুঘল বংশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৯

### বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১) মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সফল শাসক কে ছিলেন?
ক) আকবর খ) জাহাঙ্গীর গ) আওরঙ্গজেব ঘ) বাবর

২) কোন মুঘল শাসক জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তন করেন
ক) বাবর খ) আকবর গ) শাহজাহান ঘ) আওরঙ্গজেব

৩) আওরঙ্গজেব এর উপাধি কি ছিল?
ক) জহিরুদ্দিন খ) নাসিরুদ্দিন গ) নুরউদ্দিন ঘ) বাদশাহ আলমগীর

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্নঃ**

মুঘল বংশের 'ক' শাসক ধর্মীয় গুণাবলির জন্য ইতিহাসে জিন্দাপীর হিসেবে খ্যাত। বলা হয়ে থাকে যে, স্পেনের ক্ষত যেমন বীর নেপোলিয়নকে ধ্বংস করে, দাক্ষিণাত্য ক্ষত তেমনি উক্ত শাসককে ধ্বংস করে। কোন কোন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন তাঁর ধর্মীয় নীতি ও দাক্ষিণাত্যনীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল।

১. ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে কে আলমগীর উপাধি ধারণ করে নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন? ১
২. সামুগড়ের যুদ্ধ সম্পর্কে লিখুন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' শাসকের ধর্মীয় নীতি ও তার ফলাফল আলোচনা করুন। ৩
৪. আলোচ্য শাসকের ধর্মনীতি ও দাক্ষিণাত্যনীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল?– যুক্তি উপস্থাপন করুন। ৪

# পাঠ-৩.১০ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনঃ কারণ ও ফলাফল

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | **নাদির শাহ, আহমদ শাহ আবদালী, হিন্দু নবজাগরন ও সিপাহী বিদ্রোহ** |

**আওরঙ্গজেব পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ**

১৭০৭ খ্রি. সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুবরণ করেন। আওরঙ্গজের পরবর্তী মুঘল শাসকগণ হলেন যথাক্রমে;

১। বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২)
২। জাহান্দর শাহ (১৭১২-১৩)
৩। ফররুখ শিয়ার (১৭১৩-১৯)
৪। মুহাম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮)
৫। আহমদ শাহ (১৭৪৮-৫৪)
৬। দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৫৯)
৭। দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬)
৮। দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-৩৭)
৯। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-৫৮)

মুঘল বংশের সর্বশেষ শাসক ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। তিনি কবি হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তবে ইংরেজদের বেতনভোগী পুতুল সম্রাট ছাড়া তিনি আর কিছুই ছিলেন না। ১৮৫৭ সালে ইংরেজ শাসন বিরোধী সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার জন্য তাকে দায়ী করে ইংরেজরা এবং রেঙ্গুনে (ইয়াংগুন) নির্বাসন দেয়। সেখানেই তার জীবনাবসান ঘটে এবং এরই মধ্য দিয়ে ১৫২৬ সালে জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাপরাক্রমশালী মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

**মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণঃ**

**প্রথমত; শাসকের দুর্বলতা:** আওরঙ্গজেব পরবর্তী সকল সম্রাটগণ ছিলেন দুর্বল এবং ব্যক্তিগত ও চারিত্রিক শৌর্য বীর্যের অভাবহেতু কোন শাসকই বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন ঠেকাতে পারেননি।

**দ্বিতীয়ত; বিশাল সাম্রাজ্য:** উত্তরে আফগানিস্তান হতে আসাম এবং কাশ্মীর হতে মহীশুর পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল বিশাল। এত বিশাল সাম্রাজ্যকে সুরক্ষার জন্য যে দক্ষ ও যোগ্য শাসক ও শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল তা আওরঙ্গজেব পরবর্তী শাসকদের মধ্যে ছিল না।

**তৃতীয়ত; সুষ্ঠ উত্তরাধিকার নীতি:** মুঘল সাম্রাজ্যে কোন উত্তরাধিকার নীতি ছিল না। এর ফলে সম্রাটের জীবদ্দশাতেই পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ভ্রাতৃ সংগ্রাম পরিলক্ষিত হত। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব ও পরবর্তী শাসকগণ প্রায় সবাই নিষ্কন্টকভাবে সিংহাসন পাননি। বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে সিংহাসন দখল করতে হয়েছিল।

**চতুর্থত; এককেন্দ্রিক রাজতন্ত্র:** শাসনতান্ত্রিকভাবে মুঘল সাম্রাজ্য ছিল এককেন্দ্রিক রাজতান্ত্রিক শাসন। ১৭ জন সম্রাটের মধ্যে মাত্র ৬ জন যোগ্য শাসক ছিলেন। ব্যক্তিগত দুর্বলতাও দক্ষতার অভাবে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা রোধ করা শাসকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

**পঞ্চমত; আদর্শহীন রাজনীতি:** আদর্শহীনতা ও নৈতিকতার অভাবে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। পারিবারিক সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং সকলেই স্বার্থের জন্য কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করেছিল।

**ষষ্ঠত; নৈতিকস্খলন:** শাসক ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যকার নৈতিক স্খলন, ইন্দ্রিয়াসক্ততা ও বিলাস ব্যসন, হেরাম প্রথা মুঘল সাম্রাজের ভিতকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

**সপ্তমত সামরিক দুর্বলতা:** গৌরবের যুগের সেই শৌর্যবীর্য মুঘলদের রক্তে আর ছিল না। শ্রেষ্ঠ শাসক ও তাদের সুদক্ষ সেনাপতি যারা ভারতীয় পারসিক, তুর্কি ও আফগান বংশোদ্ভূত ছিলেন তাদের অভাবে মুঘল সেনাবাহিনীর ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। সৈন্যদের বিশৃংখলা, বিলাসীতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ নৈপুণ্যতাকে ঢেকে দিয়েছিল।

**অষ্টমত অর্থসংকট:** বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন ও বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিপালনে যে অর্থের দরকার ছিল তা মুঘল শাসকগণ আহরণ করতে পারেনি। বিলাসীতা, ইমারত, স্থাপত্য ও প্রশাসনিক ব্যয় মুঘল কোষাগার শূণ্য করে দিয়েছিল।

**নবমত কেন্দ্র-বিচ্ছিন্নতা:** বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসক, সুবাদার, নবাব নিজ নিজ অঞ্চলে কেন্দ্রের দুর্বলতা ও দূরত্বের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে, এতে কেন্দ্র তার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

**দশমত হিন্দু জাতীয়তাবাদ:** শিবাজীর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তির উত্থান ও একক হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা মুঘল সার্বভৌমত্বের প্রতি সবচেয়ে বড় আঘাত ছিল। ক্রমাগত মুঘল-মারাঠা বিদ্রোহ সাম্রাজ্যের ভিতকে দুর্বল করে দেয়।

**প্রত্যক্ষ কারণ:**

**প্রথমত নাদির শাহ এর অভিযান:** পারস্যের শাসক নাদির শাহ ১৭৩৯ সালে কান্দাহার থেকে মুঘল সাম্রাজ্যে আক্রমণ করেন। দুর্বল শাসক মুহাম্মদ শাহ তা প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। নাদির শাহ ভারত হতে বিপুল ধনরত্ন, কোহিনূর, হীরা ও ময়ুর সিংহাসন পারস্যে নিয়ে যান।

**দ্বিতীয়ত আহমদ শাহ আবদালীর অভিযান:** আহমদ শাহ আবদালী শিখ ও মারাঠাদের সাথে যুদ্ধ করেন। ১৭৫৬ খ্রি. ২য় আলমগীরকে পরাজিত করে দিল্লি দখল করেন। সম্রাট আপোষ করে তার অস্তিত্বকে রক্ষা করেন কিন্তু এতে মুঘল সাম্রাজ্যের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়।

**তৃতীয়ত ইউরোপীয়দের আগমন:** বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে আগত ইউরোপীয় বণিকগণ ক্রমশই শক্তিশালী হতে থাকে এবং রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ শুরু করে। তারা মুঘল প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সুযোগ নেয় এবং রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

**চতুর্থত সিপাহী বিদ্রোহ ও চূড়ান্ত আঘাত:** ১৮৫৭ সালে ইংরেজবিরোধী সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হলে ক্ষমতাবান ইংরেজরা তার দায়ভার শেষ শাসক ২য় বাহাদুর শাহের কাধে অর্পণ করে। তাকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরই মধ্যদিয়ে দীর্ঘ ৩০০ বছরের মুঘল শাসনের অবসান ঘটে।

**মুঘল শাসনের পতনের ফলাফল:**

মুঘল শাসনের পতনের প্রভাব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। মুঘল শাসনের পতনের ফলে:

১) ভারতবর্ষের রাজনীতির ঐক্য শেষ হয়ে যায়
২) ইংরেজ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।
৩) ভারতবর্ষ ইংরেজ শোষণের শৃংখলে আবদ্ধ হয়।
৪) ভারতীয় মুসলমানদের পতনের সূত্রপাত হয়।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | **মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো লিখুন।** |
|---|---|

**সারাংশ**

মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ছিল ইতিহাসের এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় কারণই এই বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার পিছনে দায়ী ছিল। সর্বোপরি, সম্রাটদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা, আঞ্চলিক স্বাধীনতা, হিন্দু নবজাগরণ, ও বৈদেশিক আক্রমণ বিশেষকরে ইংরেজদের রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি মুঘল বংশের পতনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ হিসাবে বিবেচিত। মুঘল শাসনের পতনের ফলে ভারত প্রায় ২০০ বছরের পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হয় এবং সেই ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের যবনিকাপাত ঘটে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১০

**বহু নির্বাচনী প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১) মুঘল বংশে মোট কতজন শাসক ছিলেন?
ক) ১৭ জন খ) ১৮ জন গ) ১৯ জন ঘ) ২০ জন

২। সর্বশেষ মুঘল শাসক কে ছিলেন?
ক) ২য় বাহাদুর শাহ খ) ২য় আকবর গ) ২য় আলমগির ঘ) ২য় শাহ আলম

৩। সিপাহী বিপ্লবের দায়ভার ইংরেজরা কার উপর অর্পণ করে?
ক) আকবর খ) শিবাজী গ) ২য় বাহাদুর শাহ ঘ) সুজাউদ্দৌলা

৪। আহমেদ শাহ আবদালী কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন?
ক) মারাঠা খ) রাজপুত গ) ইউরোপীয় ঘ) বাংলা

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্নঃ**

বিল্লাল হোসাইন দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বললেন- ভারত উপমহাদেশে পর্যায়ক্রমে বহু রাজবংশের উত্থান ও পতন ঘটেছে। বিশ্ব ইতিহাস বড় নির্মম, আজ যে জাতি উন্নতির চরম শিখরে কাল তার পতন ঘটবেই। তেমনি মুঘল বংশ ও দীর্ঘ ৩০০ বছর ভারতবর্ষের শাসন পরিচালনা করেও পতনের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

১. মুঘল বংশের পতন ঘটে কত খ্রিস্টাব্দে? ১
২. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ সম্পর্কে কি জানেন? ২
৩. দীর্ঘ ৩০০ বছরের প্রতিষ্ঠিত এই রাজবংশটির পতনের কারণগুলো আপনার পাঠ্যবইয়ের আলোকে তুলে ধরুন। ৩
৪. সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে মুঘল শাসনের পতন ঘটে- আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন। ৪

# পাঠ-৩.১১ মুঘল প্রশাসন, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- মুঘল প্রশাসন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মুঘল আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ও
- মুঘল সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | **ভকিল, মীর সামান, মীর বকশি সদর-উস-সুদুর, কাজী-উল-কুজ্জাত, তানসেন ও সুবাদার** |

সম্রাট আকবর ও হুমায়ুন মুঘল সাম্রাজ্যের চিত্র রচনা করলেও মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থা মূলত: আকবরেরই সৃষ্টি। আকবর ভারতীয় এবং বৈদেশিক শাসন ব্যবস্থার সংমিশ্রনে মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, নিম্নে সংক্ষিপ্ত রূপে মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হলো।

**মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থা**

মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থা দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। প্রথমত; কেন্দ্রিয় শাসন ও দ্বিতীয়ত; প্রাদেশিক শাসন

**কেন্দ্রিয় শাসনব্যবস্থা**

মুঘল কেন্দ্রিয় শাসনের মধ্যমণি ছিলেন সম্রাট নিজে। তিনি ছিলেন আইনপ্রণেতা এবং সকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিস্পত্তি কারী। সম্রাট ছিলেন ধর্মীয়, সেনাবাহিনী ও প্রশাসন যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু। তার ক্ষমতা ছিল অসীম।

**উজির:** সম্রাটের পরেই এই পদাধিকারী ব্যক্তি ছিলেন মূলত সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। সম্রাট ও অন্যান্য শ্রেণির মধ্যে তিনি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করতেন।

**দিউয়ান:** কেন্দ্রিয় সরকারের অর্থ বিষয়ক ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন দিউয়ান।

**মীর বকশি:** কেন্দ্রের সামরিক ব্যবস্থাপনার প্রধান কর্মকর্তার নাম ছিল মীর বকশি। সৈন্য নিয়োগ, বেতন প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব ছিল তার।

**মীর সামান:** মীর সামান বা খান-ই-সামান ছিলেন রাজকীয় গৃহস্থালীর প্রধান।

**সদর-উস-সুদুর:** সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় এর প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন সদর উস-সুদুর।

**কাজী-উল-কুজ্জাত:** কাজী-উল-কুজ্জাত বা প্রধান কাজী ছিলেন সম্রাট কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় প্রধান।

**প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা**

কেন্দ্রের ক্ষমতা বন্টনের অবিকল রূপ ছিল প্রাদেশিক শাসন কাঠামোতে।

**সুবাদার:** সুবা বা প্রদেশের প্রধান। সম্রাট কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত সুবার সকল সামরিক ও বেসামরিক প্রধান।

**দিউয়ান:** প্রাদেশিক শাসনের প্রধান অর্থ ও রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন দিউয়ান।

**কাজী:** প্রাদেশিক কাজী, যিনি কেন্দ্রের কাজী-উল-কুজাত দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন।

**বকসী:** প্রাদেশিক সামরিক বিভাগের প্রধান ছিলেন দিউয়ান।

রাজ্য শাসনের সুবিধার্থে সাম্রাজ্যকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। মুঘল প্রশাসনিক স্তরবিন্যাসের স্বরূপ ছিল নিম্নরূপ:

**প্রশাসনিক স্তর:** মোট ৩টি প্রশাসনিক ইউনিটে সব প্রদেশ বিভক্ত ছিল

$(i)$ সরকার বা জেলা-প্রধান কর্মচারী ফৌজদার

$(ii)$ পরগনা-প্রধান কর্মচারী শিকদার

$(iii)$ গ্রাম-প্রধান কর্মচারী মুকাদ্দেম।

**মুঘল শাসনামলে আর্থ-সামাজিক অবস্থাঃ**

**ক) মুঘল অর্থনীতি**

অর্থনৈতিক দিক থেকে মুঘল সাম্রাজ্য ছিল সমৃদ্ধশালী। এই সময় স্থল ও নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। আগ্রা, লাহোর ও বাংলা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে সুনাম লাভ করে। বণিকদের নিরাপত্তা ও সরাইখানার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় সুতিবস্ত্র ও চিনি, চাল, গম ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হত। লেনদেনের জন্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। মুদ্রার নাম ছিল তাম্রমুদ্রা, দাম, ফুলুম ইত্যাদি। কৃষি ও শিল্পপণ্য তখন উৎপাদিত হত। কার্পাস, তামাক, নীল ও পশম উৎপন্ন হত। ঢাকার মসলিন ছিল এই সময়ে জগৎ বিখ্যাত।

**খ) সামাজিক অবস্থা**

মুঘল সমাজব্যবস্থা মূলত ৩টি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল,

$(i)$ **অভিজাত শ্রেণিঃ** এই স্তরে ছিলেন সম্রাট, মন্ত্রী, সেনাপতি, আমির ওমারাহ। তাঁরা উচ্চবিলাসী ও প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।

$(ii)$ **মধ্যবিত্ত শ্রেণিঃ** মূলত, সরকারি বিভিন্ন কর্মচারী, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বণিক শ্রেণী ব্যবসায়ী ও মহাজন এই শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন এদের জীবনযাপন ছিল সাধারণ ও রুচিশীল।

$(iii)$ **নিম্নশ্রেণিঃ** সর্বশেষ স্তর ছিল নিম্নশ্রেণি। এরা ছিল কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, দাস ও সেবক ইত্যাদি। এরা খুব নগণ্য পোশাক পরিধান করত ও অনেকটা শৃংখলিত জীবন যাপন করতো। এদের জীবন ও জীবিকা ছিল কষ্টসাধ্য। সমাজে বহুবিবাহ রীতি প্রচলিত ছিল। বাল্যবিবাহ, সহমরণ ও সতীদাহ প্রথা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

মুসলিম সমাজ ঈদ উৎসব, বিবাহ ও নওরোজ উৎসব অত্যন্ত জাকজমকের সাথে পালন করতো। হিন্দু সম্প্রদায়ও পালা-পার্বণ, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করতো।

**সাংস্কৃতিক অবস্থা**

ভারতীয় উপমহাদেশে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সুকুমার বৃত্তি চর্চার সিংহভাগ কৃতিত্ব মুঘলদের। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই মুঘল শাসন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। এই সময় ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও নানা রকম সামাজিক উৎসব সমাজে প্রচলিত ছিল। বিবাহ, নামকরণ, আকিকা ও খৎনা উৎসব প্রচলিত ছিল। এই সব উৎসবে অভিজাত রুচির খাবারের প্রচলন মুঘলরাই করেছিল। উৎসবকে কেন্দ্র করে এবং রাজদরবারে সংগীত এর প্রচলন ছিল। সম্রাট আকবরের রাজদরবারে তানসেন নামক বিখ্যাত সংগীতশিল্পী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এছাড়াও ছিলেন রামদাস, বিলাস খান ও সুরদাস প্রমুখ সংগীতশিল্পী। মুঘলসমাজে নারীরা সম্মানিত ছিল। এ যুগে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নারীর কথা আমরা জানতে পেরেছি। মুঘল শাসকগণ শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেক সম্রাট নিজেই তাঁদের আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন। ইতিহাস চর্চা এই যুগে একটি রীতিতে পরিনত হয়। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর এর রাজত্বকাল ছিল মুঘল চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ সময়। ভারতীয়, পারসীক, তৈমুরীয় ও ইউরোপীয় রীতির চিত্রকলার বিকাশ ঘটে এই সময়।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | **মুঘল শাসনামলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরুন।** |

**সারাংশ**

ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘলদের ইতিহাস শুধুমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে নয় বরং মুঘলরা ভারতবর্ষে আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনাকারী। আজকের এই উপমহাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য তার সিংহভাগ অর্জিত হয়েছে মুঘলদের তিনশত বছরের শাসনামলে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১১**

**বহু নির্বাচনী প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১। মুঘল প্রশাসনযন্ত্রকে কয়টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ৫টি

২। ভকিল' পদটি দ্বারা কি বুঝায়?
ক) উজির খ) প্রধানমন্ত্রী গ) সেনাপতি ঘ) দ্বাররক্ষী

৩। অর্থ ও রাজস্ব বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বলা হত-
ক) দিউয়ান খ) সেরেস্তাদ্বার গ) ভকিল ঘ) কানুনগো

৪। প্রদেশের প্রধান কর্তাকে কি বলা হত?
ক) কাজী খ) সুবাদার গ) দিউয়ান ঘ) আমির

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্নঃ**

জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর
↓
নাসিরউদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন
↓
জালালউদ্দিন মুহম্মদ আকবর
↓
নূরউদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর
↓
শিহাবউদ্দিন মুহম্মদ শাহজাহান
↓
মহিউদ্দিন মুহম্মদ আওরঙ্গজেব

১. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজবংশের শেষ শাসক কে ছিলেন? ১
২. উক্ত বংশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে লিখুন। ২
৩. উক্ত বংশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। ৩
৪. আপনি কি মনে করেন, বহি:শত্রুর আক্রমণে উক্ত রাজবংশটির পতন ঘটে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে যুক্তি তুলে ধরুন। ৪

# পাঠ-৩.১২ মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন;
- মুঘলদের নির্মিত বিভিন্ন স্থাপত্য কর্মের বর্ণনা দিতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | **সালিমার উদ্যান, দিউয়ান-ই-খাস, দিউয়ান-ই-আম, শীষমহল, আগ্রা দুর্গ ও মতি মসজিদ** |

## মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন

শিল্পকলার প্রতি মুঘলদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল সর্বজনবিদিত। সমগ্র মুঘল যুগে স্থাপত্য শিল্পের এক নব যুগের সূচনা হয়। কয়েকজন মুঘল শাসক স্থাপত্যশিল্পে তাদের নিজস্বতা প্রকাশ করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে সম্রাটরা যে আকর্ষণীয় স্থাপত্যশৈলী নির্মাণ করেন, সেগুলো তাদের রুচি এবং সংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রমাণ।

সম্রাট শাহ্জাহান নির্মিত তাজমহল

সম্রাট বাবর ও হুমায়ুন প্রাথমিকভাবে স্থাপত্যশিল্পের সূচনা করেন কিন্তু সম্রাট আকবরের সময় হতে স্থাপত্যশিল্প এক নতুন রূপ লাভ করে। আকবরের রাজধানী ফতেহপুর সিক্রি স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম উদাহরণ। আকবর তার স্থাপত্যে লাল রং এর বেলে পাথর ব্যবহার করেছিলেন। ফতেহপুর সিক্রিতে তিনি বহু অট্টালিকা নির্মাণ করেন। এই সমস্ত ভবনের মধ্যে জামে মসজিদ, বুলন দরওয়াজা, শেখ সেলিম চিশ্তীর সমাধি, দিওয়ান-ই-খাস, সোনাহালা মকান, আম্বর প্রাসাদ, যোধবাঈয়ের প্রাসাদ এবং খাওয়াবগাহ উল্লেখযোগ্য। আগ্রা নগরীরতে তিনি দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, আগ্রা ফোর্ট - নির্মাণ করেন। সেকেন্দায় অবস্থিত আকবরের সমাধি অপূর্ব স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন। সম্রাট জাহাঙ্গীর চিত্রকলায় বেশি উৎসাহী ছিলেন। তথাপি তিনি কাবুল ও লাহোরের মনোরম প্রাসাদ ও উদ্যান তৈরী করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে বেগম নূরজাহান আগ্রাতে তাঁর পিতা ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিতে একটি সৌধ নির্মাণ করেন। এটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি। এই সৌধে পিত্রাভুরা অর্থাৎ বিভিন্ন রং-এর মূল্যবান পাথর ব্যবহার করা হয়েছে।

Prince of Builders নামে খ্যাত মুঘল সম্রাট শাহজাহান ছিলেন স্থাপত্যের বরপুত্র। তার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব আগ্রার তাজমহল। এছাড়া Red Fort (লাল কেল্লা), সালিমার উদ্যান, দিউয়ান-ই-খাস, দিউয়ান-ই-আম, শীষমহল, আগ্রা দুর্গ, মতি মসজিদ ইত্যাদি অমূল্য স্থাপনা রেখে গেছেন। তার স্থাপত্যে শ্বেত মর্মর পাথরের ব্যবহার স্থাপত্য শিল্পে এক নতুন সংযোজন। এছাড়াও তিনি দিল্লি জামে মসজিদ ও Humayun Tomb ইত্যাদি বিখ্যাত স্থাপনা নির্মাণ করেছেন। মুঘলদের মসজিদ, উদ্যান, দুর্গ, প্রাসাদ ও সমাধিক্ষেত্র আজও ভারতবর্ষের ঐতিহ্য বহন করছে এবং মুঘলদের আভিজাত্য ও মেধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে টিকে আছে।

| | | |
|---|---|---|
| | **শিক্ষার্থীর কাজ** | **মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল মুঘল আমলে-ব্যাখ্যা করুন।** |

## সারাংশ

স্থাপত্য বিদ্যায় মুঘলদের অবদান ছিল মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে মিলেমিশে আছে মধ্যএশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশের যোগসূত্র। তাই মুঘল স্থাপত্যনিদর্শন মুঘল ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১২

**বহু নির্বাচনী প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১। ফতেহপুর সিক্রি নগরী নির্মাণ করেন-
ক) আকবর খ) বাবর গ) হুমায়ূন ঘ) সেলিম

২। তাজমহল নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল
ক) লাল পাথর খ) ইট গ) শ্বেত মার্বেল ঘ)

৩। মুঘলদের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন হলো–
ক) লালকেল্লা খ) দিউয়ান-ই-খাস গ) শিশমহল ঘ) তাজমহল

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্নঃ**

আবু সাঈদ ভারতে বেড়াতে গেলে মধ্যযুগের একটি রাজবংশের বিভিন্ন নিদর্শন, স্থাপত্যশিল্প দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি স্থাপনা যেটি ছিল স্ত্রীর প্রতি প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ, সেটি দেখে আবু সাইদ ভাবলেন এমন অনিন্দ্য সুন্দর স্থাপনা সত্যিই সেই বংশের স্মৃতিকে আজও বহন করে আছে।

১. ময়ুর সিংহাসনের স্থপতি কে ছিলেন? ১
২. মুঘল শাসনের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিন। ২
৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত সপ্তাশ্চর্যটি মুঘল বংশের কোন শাসকের স্মৃতি বহন করে আছে ব্যাখ্যা করুন। ৩
৪. সম্রাট শাহজাহানের কৃতিত্ব সেখানে ইট-সুরকির মধ্যে" এ মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। গ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ ঃ ১। ক ২। গ ৩। গ ৪। গ ৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ ঃ ১। গ ২। খ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ ঃ ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ক ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৮ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৯ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১০ ঃ ১। ক ২। ক ৩। গ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১১ ঃ ১। ক ২। ৩। ক ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১২ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ঘ